বিহঙ্গবিলাস

বিহঙ্গবিলাস

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

কথামালা প্রকাশনী
কলেজস্ট্রীট মার্কেট ১৮এ ; কলিকাতা-১২

প্রকাশক। শ্রীপ্রণবকুমার বসু ; কথামালা প্রকাশনী
কলেজস্ট্রীট মার্কেট ১৮এ ; কলিকাতা-১২
মুদ্রক। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান, নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট। শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রক। রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
দাম। ৩'০০

উৎসর্গ

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

ও

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

হাজার কাজের ফাঁকে ঠিক সময়টাতেই ভিড়ের একপাশে এসে দাঁড়ালেন নীরজাসুন্দরী। বলতে গেলে এখন তাঁর মরবার ফুরসৎ পর্যন্ত নেই কিন্তু তাই বলে এমন একটা সময়ে কিছুতেই দূরে সরে থাকতে পারলেন না তিনি। থাকা যায়ও না। দশটা বিশটা নয়, ওই একটা মাত্র মেয়ে তাঁর যমুনা। দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছেন। তারপর যখন হলো মেয়েটা, কত রাত বিনিদ্র কেটেছে তাঁর। দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দুর অণুেত অণুতে গড়া তাঁরই একটা অংশ। সেই যমুনা চিরকালের মত পর হ'য়ে যাচ্ছে আজ। সংসারের নিয়ম অনুযায়ী আজ থেকে ও মেয়ের ওপোর আর কোন দাবী-দাওয়াই থাকলো না নীরজাসুন্দরীর। পর হয়ে গেলো। চিরকালের মত বুকের ধন দূরে সরে গেল। ওর ঘর-সংসার হলো। নারী-জীবনের সার্থক পর্যায়ে পা বাড়ালো যমুনা। এই সব কথা চিন্তা করে দুটো চোখ যে ছলছলিয়ে উঠছি'লো না এমন নয় কিন্তু এমন একটা সময়ে কোন কাজের মধ্যে কিছুতেই নিজেকে বন্দী রাখতে পারলেন না নীরজাসুন্দরী। উলুধ্বনি কানে আসতেই ভাড়ারের কোণায় রাখা ঘটির জলে তাড়াতাড়ি হাতটা ধুয়ে, আঁচলে ঘষতে ঘষতে এগিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন ভিড় করা মেয়েদের দলের একপাশে, ছাদনাতলায়।

আসলেও এ সময়টা তাঁর কাছে কাছে থাকাই উচিত। একমাত্র মেয়েই শুধু নয়, একমাত্র সন্তানও বটে যমুনা। পর পর তিন তিনটি সন্তান তাঁর গর্ভে এসেছিলো। দুই তিন-চার বৎসরের ব্যবধানে পর পর সব কটি শত্রু ফাঁকি দিয়ে চলে গেলো। তারপর যমুনা। হ্যাঁ, সেই তিন শত্রুর পর। সোজা সহজে কি আর ওই মেয়ে বেঁচে আছে, এত বড়টি হতে পেরেছে। বুড়ো শিবতলার গাজনের মেলায় মানত করে, তবে। এগারো মাস বয়সের সময় কালীঘাটের মায়ের কাছে পূজো মানত। চন্দ্রপুরের বেহ্মচারীর মাদুলি ধারণ করিয়ে তবেই না বাঁচাতে পেরেছেন ওই একটি মাত্র সলতে যমুনাকে।

ভিড়ের একপাশে এসে দাঁড়ালেন নীরজাসুন্দরী। মেয়ের এখন শুভদৃষ্টি। একটু যে এগিয়ে যাবেন তার জো-টি পযন্ত নেই। পাড়া-পড়শী মেয়ে এয়োরা

ভিড়ের ব্যূহ রচনা করেছে। সাধ্য কি এই ভিড় ঠেলে এগুবেন! একটু যে ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাবেন তাতেও কেমন একটা সংশয়। মেয়েরা কি মনে করবে কে জানে। হয়তো বলে বসবে—দেখ, নিজের মেয়ের বিয়েতে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হ'য়ে পড়ছেন।

পায়ের পাতার ওপোর ভর করে গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলেন নীরজাসুন্দরী, ঠিক সেই সময়টাতেই পাশ থেকে কে যেন কথা বললো—সর, সরগো তোমরা। কন্তের মা-কে এট্টু জায়গা দাও।

অলঙ্ঘ্যনীয় ব্যূহটা পাতলা হ'য়ে এলো। সরে সরে দাঁড়ালো মেয়ে আর এয়োতিরা।

নীরজাসুন্দরী এগিয়ে গেলেন। এগুলেন বটে কিন্তু সবটা নয়। একেবারে সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াতে কেমন যেন মন সরলো না তাঁর। যেখানে দাঁড়ালেন, সেখান থেকে স্পষ্ট সবটাই দেখা যাচ্ছিলো। দেখলেন—দুই জোয়ানে ধরা পিঁড়িটাতে চেলির ঘেরাটোপের মধ্যে নিজেকে যেন আড়াল করে রেখেছে যমুনা। সঙ্কুচিত হ'য়ে বসে রয়েছে। ওরা ঠিক বরের মুখোমুখি তুলে ধরেছে পিঁড়িটা। ঘোমটা তুলেছে একজন। আর পাশ থেকে কারা যেন বলছে—তোলো, তোলো, মুখ তোলো যমুনা। তাকাও।

ওই পিঁড়িটাতে স্থাণুর মত বসে রয়েছে যমুনা। তাকাচ্ছে না। যেন গুঁটিসুটি জড়ভরত।

পাত্রপক্ষের একটি ছেলে কি একটা টিপ্পনী কাটলো, শুনলেন নীরজাসুন্দরী। এপাশ ওপাশ থেকে সমস্বরে কেউ কেউ মুখ তুলতে বলছে, বলছে তাকাতে কিন্তু মোটেই চোখ খুলছে না যমুনা। মেয়েটা বড্ড একগুঁয়ে, কথা শোনবার নামটি পর্যন্ত নেই। সেই যে ঘাড় গোঁজ করে বসে আছে তো আছেই। না নড়ছে, না চড়ছে।

—থাক, কে একজন বয়স্ক লোক পাশ থেকে বললেন। বললেন—দাও তো মা, মালাটা পরিয়ে দাও ছেলের গলায়।

পাশ থেকে পাত্রপক্ষের এক ছোকরা খেঁকিয়ে উঠলো—মালা পরাবে মানে? শুভদৃষ্টির সময় মেয়ে তাকাবে না সেটা কি একটা কথা হলো নাকি?

—তাকাবে, নিশ্চয়ই তাকাবে। বয়স্ক লোকটি বললেন—তাকাবে বই কি। মালাবদলের সময় না তাকালে মালাটাই বা গলায় পরিয়ে দেবে কি করে।

ঈশানচন্দ্র কথাটা বললো। শুনলেনও নীরজাসুন্দরী। আজ কর্তা বেঁচে থাকলে কি এমনটা হতে পারতো নাকি? না হতে দিতেন? একে তিনটির পর, তায় বাপহারা অভাগী মেয়ে। সম্প্রদানটা পর্যন্ত করতে হ'লো ঈশান-চন্দ্রকে। না, অনাত্মীয় নয়। নীরজাসুন্দরীর মাস-শশুরের ছেলে। কন্যা-কর্তা বলতে গেলে এখন সে-ই।

অনেক অনুরোধ, উপরোধ তারও অনেক পরে তাকালো যমুনা। মালাটা আলগোছে পরিয়ে দিলো বরের গলায়। নীরজাসুন্দরী দেখলেন, যমুনার চোখের কোলে জলের দাগ তখনও মুছে যায় নি।

ভয়ই পেয়েছিলেন নীরজাসুন্দরী। যে একগুঁয়ে মেয়ে, বলা যায় না শেষ পর্যন্ত কি করে বসে। তা ছাড়া আজ ক'দিন ধরে কী কান্নাটাই না কেঁদেছে। ক'দিন খায়নি দায়নি শুধুই ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে এই ক'দিনে মেয়েটা যেন অর্ধেক হ'য়ে গেছে। শেষকালে আবার একটা অসুখ-বিসুখ না বাধিয়ে বসে মেয়েটা। তা হ'লে শুধুই যে বিয়ে পিছিয়ে যাবে তা নয়। কিসের মধ্যে কী একটা অনাছিষ্টি করে বসবে কে জানে।

তাড়াতাড়ি ভিড়ের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এসে ভাড়ার ঘরের বারান্দায় দাঁড়ালেন নীরজাসুন্দরী। আসলে তিনিও টিকতে পারছিলেন না ওখানে। একরকম জোর জবরদস্তি করেই বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়েটার। তাঁরই কি সাধ ছিলো নাকি? কিন্তু যা হবার নয় তাই নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে লাভটা কী? তা নইলে বিশ্বনাথের মত অমন দেবতুল্য ছেলের হাতে মেয়ে দিতে তাঁরই কি আপত্তি ছিলো নাকি?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন—মেয়েটা বড় দাগা পেলো মনে। এ দাগা ওর জীবনে চিরকাল থাকবে না সত্যি কিন্তু মেয়ের বিষ-নজর থেকে তিনিই কি মুক্তি পাবেন কোনদিন? কোনদিনও কি এরপর ভাল চক্ষে তাঁকে দেখবে যমুনা ?

আগে যদি জানতে পারতেন একটা বিহিত না হয় করা সম্ভব হতো। ছেলেটার সঙ্গে বড় হবার পর মিলমিশ করতে না দিলেই ল্যাঠা চুকতো। কিন্তু তিনিই বা কি করে জানবেন যে পনেরো বছরের ওইটুকু মেয়ের মধ্যে পঁচিশ বৎসরের একটা মন দিনে দিনে তৈরী হয়েছে। অমন বয়সে নিজেরাও কি কম খেলাধুলা করেছেন নাকি কিন্তু যমুনার মত এমন করে পাগল হ'তে পেরেছিলেন কি! না, সামান্য একজন খেলার সঙ্গীর জন্য এমন করে

কেঁদেকেটে আকুল হ'তে পেরেছিলেন। কোনোটাই নয়। সেই সব ভেবেই না মিশতে দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তো ওরা দুজনে খেলাধূলা করতো, সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। ভালো তরি-তরকারী রান্না হ'লে ওই ছেলেটাকে না দিয়ে পারতেন না নীরজাসুন্দরী। ডেকে পাশে বসিয়ে খাওয়াতেন। অমন শান্ত-শিষ্ট স্বভাবের ছেলে পাড়ায় আর দুটি নেই। কিন্তু অঙ্কুরের মধ্যে মহীরুহের সম্ভাবনার কথা নীরজাসুন্দরী জানবেন কেমন করে!

চৌদ্দ পেরিয়ে যেতে বিয়ে হয়েছিলো নীরজাসুন্দরীর। গ্রাম-পল্লীতে ও বয়সটাই একটু বাড়াবাড়ি। এই নিয়ে গ্রামের লোকেরা কি কম কথা শুনিয়েছে নাকি তাঁর বাবাকে! কিন্তু বিয়ে বললেই তো আর বিয়ে নয়। জোগাড়যন্ত্র কর, আয়োজন-অনুষ্ঠান, টাকাকড়ি সংগ্রহ তবেই না বিয়ে। গরিবের ঘরের মেয়ে চট্ করে কি আর পার করা সহজ? দেখাশুনা, পছন্দ-অপছন্দের পালা চুকতে লক্ষ কথা। তাও কয়েক বৎসরের ধাক্কা। তারপর হলো গিয়ে বিয়ে। কিন্তু ও বয়সেও কি কিছু জানতেন নাকি। শ্বশুর-শাশুড়ীর আওতায় এসে শিখলেন সব কিছু। স্বামী বিদেশে-বিভূঁয়ে চাকরী করে, মাঝে মধ্যে তাঁর আসা-যাওয়া। বৎসরে ক-টা দিন আর দেখা হ'তো তাঁর সঙ্গে?

এখন প্রায় বুড়ো হবার মুখে হাজির হয়েছেন বটে কিন্তু তাই বলে পুরোণো কথাগুলো কি আর ভুলতে পেরেছেন নাকি? বিয়ে হবে, বিয়ে হবে কথাটা শুনলে ভয় করতো। পরের সংসারে অচেনা একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি করে থাকবেন, না আছে জানা, না শোনা কিন্তু তাই বলে উপায় কী? মেয়ে হয়ে জন্মেছেন যখন পরের ঘরে তো যেতেই হবে।

নিজের শুভদৃষ্টির কথাটাও বেশ মনে রয়েছে নীরজাসুন্দরীর। প্রথমটা তিনিও তাকাতে পারেন নি হট করে। দু' একজন অনুরোধ করলো তারপর চোখ খুললেন। তাকিয়ে মুগ্ধই হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন।

মনের মতই লোকটা চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে। যেমন দেখতে ফর্সা, তেমনি গড়নে-পিটনে। একেবারে দেবতার মত সুপুরুষ। তাই ভাবছেন নীরজাসুন্দরী, আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন কত আনন্দ ফূর্তিই না করতেন। ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো ছল্‌ছলিয়ে উঠলো তাঁর।

কিছুক্ষণ বাদেই হৈ-চৈ করে এলো সব মেয়ে আর এয়োতির দল। যারা এতক্ষণ ভিড়ের ব্যূহ তৈরী করে ছাদনাতলা ঘিরে রেখেছিল। শুভদৃষ্টি

সম্প্রদানের পালা চুকবার পর যে যার ছড়িয়ে পড়েছে। এবার খাওয়া-খাওয়ির পালা। ভাঁড়ারে ঢুকতে যাবেন, ঈশান এসে দাঁড়ালো, বললো—নাও বৌঠান, পালা চুকলো এবার।

কিন্তু নীরজাসুন্দরী ভাবতে পারেননি ঈশানের দৃষ্টি এতটা প্রখর। ঘোমটাটা একটু টেনে দিতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়েই ঈশান কথাটা বলে ফেললো, বললো—শুভকর্মের সময় তোমার চোখে জল বৌঠান! তারপর একটু চুপ থেকে বললো—মেয়ে তো আর ঘরে রাখবার জন্য দেননি ভগবান। পরের ঘরে যেতেই জন্মেছে ওরা। দুঃখটা যে তোমার কোথায় বৌঠান, সে কথা কি আর বুঝি না, থাকতো আজ দাদা বেঁচে এত দুঃখ কি মনে হতো তোমার?

—না না ঠাকুরপো, দুঃখ আমি করি না। সবই আমার অদৃষ্টের লিখন।

—হ্যাঁ, ওটাই হলো গিয়ে মোদ্দা কথা। ওই কথাটাই স্মরণ রেখো।

দাঁড়ালেন না নীরজাসুন্দরী, ভাঁড়ার ঘরে চলে এলেন সাত-তাড়াতাড়ি। এখন অনেক কাজ তাঁর। বরযাত্রীরা খাওয়া দাওয়া করবে, খাবে নিমন্ত্রিতের দল। যদিও একলা নন নীরজাসুন্দরী। গ্রামের ছেলে-ছোকরা, বয়স্করা আর বউ-মেয়েরা রয়েছে বটে কিন্তু তাই বলে চিন্তাটা কি আর কম? একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে দুর্নাম হবে, হয়তো সারা জীবন সেই খোঁটাই শুনতে হবে যমুনাকে। তাই সজাগ-সতর্ক হয়ে দেখাশুনা করছেন তিনি।

যমুনার বিয়ে হ'য়ে গেলো কত আনন্দের কথা কিন্তু কি যে হ'য়েছে নীরজাসুন্দরী নিজেই ভেবে পাচ্ছেন না। মনটা যে কোথায় রয়েছে, ঠাহর করে উঠতে পারছেন না। কেমন একটা অব্যক্ত জ্বালার বিস্ময়ে চমকে চমকে উঠছেন। মনে হচ্ছে—এলো, ওই বুঝি এলো ছোড়াটা কিন্তু কোথায়?

বিশু আসবে না, এ কথাটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে নীরজাসুন্দরীর। ওই একরত্তি ছেলেটাকে কত ভালই না বাসতেন তিনি। দেখতে শুনতে একেবারে খাটি রাজপুত্তুরটি। যেমন রঙ, তেমনি গড়ন। টানাটানা চোখ। কী রূপ! ঠিক যেন ছাঁচে ঢালা একখানি সুনিপুণ হাতের তৈয়ারী।

আজ নিয়ে পুরো ছটা দিন, ছ রাত্রি। কোথায় গেল, কেন গেল আজও ভেবে পাচ্ছেন না নীরজাসুন্দরী। যমুনার বিয়ের কথা জেনেও সে আসবে না, এ কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজের মনে নিজেই কষ্ট পাচ্ছেন। কিছুতেই মনকে বুঝ দিতে পারছেন না। এই ছ-টা দিনের প্রায় প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হয়েছে

ওই বুঝি এলো, এলো বিশ্বনাথ। কিন্তু কোথায়? যে শূন্যতা আকাশে-বাতাসে, মা-মেয়ের মনে তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই। আজও ভেবেছিলেন, মনে করেছিলেন হয়তো দেখতে পাবেন হঠাতই। দেখবেন কখন এসে এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে অথবা হৈ-চৈ করে বাড়ি মাথায় করে তুলছে। কিন্তু হৈ-চৈ করবারও উপায় নেই। সোজাসুজি জানাজানি করে যে আসবে তারও উপায় নেই। যদি আসে সে কথা জমিদার গিন্নীর কানে পৌছাতে বিলম্ব হবে না। আর তাই নিয়ে হেনস্তার সীমা-পরিসীমা থাকবে না ছেলেটার। হয়তো বেঁধেছেদে মারধোরই করে বসবেন। হাজার হলেও জমিদারণী, তার দাপট যাবে কোথায়?

দলে দলে লোক পাঠিয়েছেন বড় জমিদারগিন্নী। যেখানে পাও ধরে নিয়ে এসে। সে যেমন করেই হোক। খোঁজাখুঁজি করে করে লোকগুলোও হন্যে হয়ে গেলো। উমানাথপুর থেকে উত্তরে বাঁশবেড়ে আর দেউলী থেকে পশ্চিমে সাতপাড়া—এই বিরাট এলাকাটা চষেই ফেলেছে লোকজন। লোক চলে গিয়েছে গঞ্জের ঘাটে কিন্তু এই ছ' দিনের মাথায়ও সন্ধান নেই, হদিস্ নেই।

বরযাত্রী আর গ্রামের পুরুষমানুষদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে অনেক রাত হয়ে গেলো। এবার মেয়েরা বসেছে খেতে। কি মনে হলো নিজে গিয়ে একবার ঘুরেফিরে দেখলেন নীরজাসুন্দরী। দেখে ফিরে এসে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন—শুনছিস, ও কেষ্টর মা শুনছিস নাকি লো?

কর্তা গত হবার পর থেকে কেষ্টর মা-কে রেখেছেন নীরজাসুন্দরী। বিধবা মানুষ, সংসারে আপনজন বলতে কেউ নেই। ছিলো একটা মাত্র ছেলে কেষ্ট, সেও ওলাদেবীর কুপিত দৃষ্টিতে পড়ে মারা গেছে। মেয়েমানুষটা এখন এখানেই থাকে। কাজকর্ম করে। নীরজাসুন্দরীও ভালমন্দ কেষ্টর মা-কে না দিয়ে খান না।

—কী বলছো গা, কেষ্টর মা সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

প্রথমটায় বলতে কেমন যেন ইতস্তত: করলেন নীরজাসুন্দরী। কে জানে কিসে কি মনে করবে। মেয়েমানুষটার কথার তো কোন ছাঁদ-ছিরি নেই যে কোন্ কথার উত্তরে কি বলতে হয়, আর কি অর্থ তা বুঝবে। তবুও শেষ পর্যন্ত কথাটা না চাপতে পেরে বললেন—জমিদার বাড়ির খবর-টবর কিছু শুনলি?

—ওই এক রোগ হয়েছে তোমার, আজ কদিন থেকেই দেখছি, যেন খেঁকিয়েই উঠলো কেষ্টর মা. ওকি আর ধরা দেবার জন্যে পালিয়েছে? খাঁচার পাখি ছাড়া পেয়েছে, ব্যস্।

চুপ করে গেলেন নীরজাসুন্দরী। বুঝলেন আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। কথার পিঠে কথা বলেছ কি, কেষ্টর মা ছাড়বার পাত্রী নয়। ওই ছেলেটার কথা তুলেই হয়তো দু-দশটা কথা শুনিয়ে ছাড়বে।

এই প্রথমবার নয়। এই ক-দিনে ঘুরে ফিরেই জমিদার বাড়ির খবরাখবর জানতে চাচ্ছেন নীরজাসুন্দরী। খবর আর কিছু নয়, শুধু ছোড়াটা ফিরলো কিনা সেই কথা। তা কথা শোনাতে কি কম করছে কেষ্টর মা, বলছে—নিজের পেটের ছেলে তো আর নয়। তা তুমি অত উতলা হচ্ছো কেন বাপু?

কি করে বোঝাবেন নীরজাসুন্দরী যে পেটের সন্তান না হলেও মায়ার টানটা তার প্রতি কত। সেই ছোটবেলা থেকেই তো ছেলেটা এখানে আসতো, থাকতো। খেলাধুলা করতো যমুনার সঙ্গে। মারামারি চুলো-চুলিও হতো দুজনে কিন্তু নীরজাসুন্দরী কখনও কারও পক্ষ টেনে বিচার করেন নি। বড় যখন হলো তখনও আসতো। কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে। পাছে বড় জমিদার গিন্নীর কানে পৌঁছে খবরটা।

কেমন যেন মিইয়ে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন নীরজাসুন্দরী। ঠামা, ঠামা করে ডাকতো ছেলেটা। এমন করে ডাকতো. যেন ঠামা-অন্ত প্রাণ। সেই কথাই কদিন থেকে ভাবছেন। মনে হচ্ছে কি যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছেন তিনি।

এয়োতিদের মধ্য থেকে কে একজন ত্বরিতে এসে ডাকলো। বর কনেকে আশীর্বাদ করতে হবে। ঘরে উঠে এসেছে ওরা।

আশীর্বাদ করতে গিয়ে দেখলেন, ঘরেও ভিড় কম নয়। দূরসম্পর্কের কিছু কিছু আত্মীয়-কুটুম্ব তো রয়েছেই, তা ছাড়া পাড়ায় বৌ-ঝিরাও ভিড় করেছে। একমুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়ালেন নীরজাসুন্দরী। বর-কনের সম্মুখে যেতে কেমন যেন বাধ বাধ লাগছে তাঁর। এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন, দেখলেন পাড়া-পড়শীদের মধ্যে কে কে এসেছে। তাকিয়ে কেমন যেন একটু নিরাশই হ'লেন।

বাধ-বাধটা আসলে ওই মেয়েকে। কিন্তু অবাক হলেন নীরজাসুন্দরী, বিয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এমন ধরণটা তো অনুভব করেন নি। এখন মনে হচ্ছে কি যেন একটা গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছেন মেয়ের কাছে। পেছন থেকে

কে ডাকলো, দেখলেন ঈশান চন্দ্রের বউ মনোরমা। সে বললো—যাও দিদি, তুমি আগে আশীর্বাদটা সারো, তবে আর সকলে।

আশীর্বাদ করলেন। মেয়ে-জামাই পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। প্রদীপের টিপ কপালে পরাতে গিয়ে আর একবার চমকে উঠলেন। কপাল ভুল করে হাতটা চোখে লেগে গেছে যমুনার। ঘোমটার আড়ালে যমুনা কাঁদছে। হ্যাঁ, কেমন একটা জলোস্পর্শ হাতে পেলেন নীরজাসুন্দরী। মুহূর্তে যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তারপর কোন রকমে যেন টাল সামলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়েও স্বস্তি নেই। সোজা চলে এলেন তাঁর শোবার ঘরে।

কেন যেন মনে হলো সংসারে ভগবানের বিচার নেই। বিচারই যদি থাকবে, তাহলে অমন শক্ত-সমর্থ স্বামী কি করে মরে যেতে পারলো? তাঁর কত সাধ, কত আহ্লাদ কিছুই যে পূরণ হলো না।

শাশুড়ী মারা গিয়েছিলেন নীরজাসুন্দরীর বিয়ের বছর তিনেক পরে। স্বামীর কর্মস্থল বিদেশে সুতরাং সংসারে শ্বশুর আর বউ। শ্বশুরও বেশি দিন টিকলেন না। তার বছর দুই বাদেই গত হলেন তিনি। জীবিতকালে ছেলের পাঠানো টাকা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কয়েক বিঘা জমি-জিরাতও করেছিলেন বুড়ো।

বাপ-অন্তে অনুপায় হয়ে চাকরী ছেড়ে আসতে হলো জগদীশকে। এসে দেশে বসলেন। জমি-জায়গা আরও কিছু করলেন নূতন করে। তারপর অবশ্য জমিজমার আয়েই সংসার চলে যেতো হেসেখেলে। যমুনা যখন বছর তিনেকের ঠিক সেই সময়েই পোড়া দুর্ভিক্ষ পড়লো দেশে। ব্যবসা করতে গেলেন জগদীশ। কিন্তু ব্যবসা না ছাই। মাঝখান থেকে টাকাপয়সা গেলো, ধারদেনাও কিছু ঘাড়ে চাপলো।

এই নিয়ে কথা শোনাতেও ছাড়তেন না নীরজাসুন্দরী কিন্তু লোকটা নির্বিকার হেসে বলতো—ব্যবসা করতে গেলে লাভ লোকসান আছেই।

—থাক, আমার কথাগুলো তো আর কানে গেলো না তখন? পই পই করে কত না বারণ করলাম কিন্তু এখন?

হুকার মাথায় কলকেটা চেপে বসিয়ে ফু দিয়ে আগুন উস্কাতে উস্কাতে জগদীশ বললেন—তোমার আর ভাবনাটা কী? একটা তো মাত্র মেয়ে, বিয়ে দিলেই সংসার নির্ঝঞ্ঝাট। তখন দুটো মানুষের চলতে অসুবিধা হবে না।

—চলা না-চলার কথা নয়। মানুষ সঞ্চয় করে বিপদ আপদের জন্য কিন্তু বাড়তি যা কিছু ছিলো সব তো খুইয়ে বসলে।

—বসলাম বসলাম, আবার হতে কতক্ষণ ?

কিন্তু আর হলো না। পরের বছরেই কর্তা গত হলেন। একমাত্র জায়গা-জমি ছাড়া আর দুটো পয়সা সঞ্চয় নেই। মেয়েকে ভালো ঘর-বর দেখে দিতে গেলে টাকা পয়সার প্রয়োজন। শেষকালে কি আর করেন, বিঘে দুয়েক জমি ছাড়িয়ে তবে না আজ এই মেয়ের বিয়ে।

জলপান সেরে বিছানায় গা এলিয়েছিলেন নীরজাসুন্দরী। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘুমের একটু আমেজও যে না এসেছিলো এমন নয় কিন্তু ঘুমুতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। হতচ্ছাড়া সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ছে বার বার। কেমন যেন ভয় ভয় অস্বস্তি ছলবলিয়ে উঠছে মনের মধ্যে। ছেলেটা কি সত্যিই পালালো, না আত্মহত্যা-টত্যা করে বসলো !

বাসি-বিয়ের পাট চুকতে চুকতে দুপুর গড়ালো। বিকেলের দিকে মেয়ে-জামাই বিদেয় হবার পাট। সাজানো-গোছানো কাজকর্মের লোকের অভাব নেই। কাজ থাকা সত্বেও নিজের ঘরে চুপটি করে বসেছিলেন নীরজাসুন্দরী। কিছুই ভাল লাগছে না তাঁর। মনে হচ্ছে এই সময় যদি একটু ডুকরে কাঁদতে পারতেন, তবে হযতো মনের জ্বালা নিভতো। কিন্তু কাঁদবেন কি করে! বরপক্ষের লোকজন রয়েছে, রয়েছে আত্মীয়স্বজনরা। তাদের সম্মুখে কি আর কাঁদবার বয়স আছে তাঁর ?

বাসি বিয়ে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বলতে গেলে এখন সময়ের অভাব হবার কথা নয় যমুনার। কাল না হয় মায়ের কাছে আসতে লজ্জাই করেছে মেয়ের, কিন্তু আজ ? আজ এই যে এতখানি সময় গেলো, এরমধ্যে কি একবারও সময় হয়নি, ইচ্ছা করেনি মেয়ের যে, যাই একটু মায়ের কাছে বসিগে। দুঃখ কি কম নীরজাসুন্দরীর ? একটা দিনের মধ্যেই মেয়েটা কেমন যেন পর হয়ে গেলো।

ঈশান এসে দাঁড়ালো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ইশারায় বসতে বললেন নীরজাসুন্দরী। কথা কইতে পর্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে না তাঁর।

বসতে বসতে ঈশান বললো—বৌঠানের চোখের জল দেখছি আজও ফুরলো না।

উত্তর দিলেন না নীরজাসুন্দরী।

একটু চুপ করে থেকে ঈশান বললো—তাই ঠিক বৌঠান, তাই ঠিক। সবই মানুষের ভাগ্য। তা নইলে দাদাই বা এমন অসময়ে চলে যাবেন কেন আর এ বয়সে তোমাকেই বা সংসারের টানা-হেঁচড়ার মধ্যে থাকতে হবে কেন। কথাটা শেষ করে ঈশান তাকালো নীরজাসুন্দরীর দিকে। হয়তো একটা উত্তরের প্রত্যাশায়। কিন্তু এবারেও নিরাশ হতে হলো তাকে। নীরজাসুন্দরী তেমনি নির্বাক বসে রইলেন।

শব্দ করে একটা ঢেঁকুর তুললো ঈশান। ট্যাকের ডিবা থেকে পান তুলে এক সঙ্গে গোটা তিনেক মুখে পুরে চিবোতে লাগলো। তারপর একসময় বললো—তাই ভাবি বৌঠান, তবুও একটা অবলম্বন ছিলো, ওই মেয়েটার দিকে চেয়ে তবু মনটাকে সংসারে বেঁধে রেখেছিলে, কিন্তু এখন? সংসার কি বেঁধে রাখবে তোমাকে আর?

—তা ঠিক, এতক্ষণ পরে মুখ তুলে কথা কইলেন নীরজাসুন্দরী। ঠিকই বলেছ ঠাকুরপো। কিন্তু তীর্থ ধর্ম করতে যে বেরুবো তারই কি জো আছে?

—সেই কথাই বলছিলাম আমি। হাজার হলেও বয়সে তো ভাঁটার টান লেগেছে। দেখাশুনা করারও একটা লোক চাই বই কি।

কথাটা শেষ হলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে যমুনা এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে ঈশানের স্ত্রী মনোরমা। একটা পলকের মধ্যে যমুনা ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের কোলের ওপোর। একেবারে আচমকা। তারপরই ফুলে ফুলে মেয়ের সে কি কান্না!

আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলোলেন নীরজাসুন্দরী। সব অভিমান, সব ভয় ভয় অস্বস্তির পর্বত এক মুহূর্তে বরফ-ঢেলার মত গলে গেলো। জল হয়ে গেলো। চোখের জল চাপতে পারলেন না কিছুতেই। থানের আঁচলে চোখের জল মোছবার চেষ্টা করে ধরা গলায় বললেন—না-না, কাঁদিস না মা। আবার তো আসবিই। এই তো মাত্র ক-টা দিন মধ্যে। আমি যে তোর পথ চেয়েই বসে থাকবো মা।

কিন্তু সে কথায় যমুনার ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্রও কমলো না।

অনেক সান্ত্বনার স্তোকবাক্য বললেন নীরজাসুন্দরী। বললেন—ভয় কি তোর? আমি তো রয়েছি। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, যখন খুশি যেতে পারবো তোর কাছে।

পাশ থেকে ঈশান বললো—ভাগ্য তো তোমার ভালই যমুনা। ছেলে

দেখতে-শুনতে ভালো, আয়ও যা শুনলাম খুবই ভালো। তাছাড়া সংসারে সাত-পাঁচ কোন আত্মীয়-স্বজনের ঝামেলাও নেই। বেশ সুখেই থাকবে।

কথাটা যে নির্ভেজাল সত্য তা জানে যমুনা। জানে, গুনীন কারবারী মানুষ। দোকান-পশারের ব্যবসা তার। সংসারে একেবারে একলা মানুষটি। বাপ-মা নেই, খুব একটা আত্মীয়-স্বজনের ঝামেলাও নেই। আছে একজন কাকা। সে বড় চাকুরে। সংসারে তাঁর অভাব অনটনের বালাই নেই। সুতরাং সেদিক থেকে গুনীনের সংসার একেবারে মুক্ত।

কিন্তু সান্ত্বনার স্তোকবাক্যে যদি মানুষ সব দুঃখ ভুলতে পারতো তবে পৃথিবীতে কোন মানুষেরই দুঃখ বলে কিছু থাকতো না। যমুনাও ভুললো না। ভুলতে পারলো না। কী করে সে ভুলতে পারবে? একটা মানুষের সব আশা অভিলাষ পুড়ে ছাই করে দিয়ে শুধু সান্ত্বনার বাক্যেই কি তাকে সব ভুলিয়ে দেওয়া যায়? না, যায় না। সেই জন্যেই যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না যমুনা। মনে হচ্ছে, সকলে মিলে একটা বিরাট চক্রান্ত করে ওকে জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। সে জল এত গভীর যে তা থেকে কোনদিনই মুক্তি পাবে না যমুনা। ওই অতল জলের গভীরে যমুনা নিজে একদিন দম বন্ধ হয়ে ছট্‌ফটিয়ে মরে যাবে। যে তুষের আগুনের সম্ভাবনা শুধু আজকের চক্রান্তের জন্য মনে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ওকে, সে আগুন কোনদিনও কি নিভবে? না নিভবে না। ওই আগুনের ধিকি-ধিকি জ্বালার বহ্নিশিখায় দিনে দিনে ক্ষয়িত চাঁদের মত ওর প্রাণও শেষ হবে। পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে অব্যক্ত জ্বালার তপ্ত অঙ্গারে।

দু একটি করে লোক জমছে ঘরে। কনে বিদায়ের সময় এখন। আর বিলম্ব করার উপায় নেই। রূপনগরের ঘাটে তিন মাল্লাই নৌকো তৈরী। নীরজাসুন্দরী বললেন—ওঠ মা, ওঠ। হ্যাঁরে, মনে নেই তোর সেই ভগবতীর উপাখ্যান? তাঁরই কি মন চায় নাকি? কিন্তু কদিন? সোয়ামীর সংসার ছেড়ে দেবতা হয়েই বা ক'দিন থাকতে পারেন বাপের বাড়ি?

আবার একটা হাউহাউ শব্দ। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে যমুনা। পনেরো বছরের ওইটুকু মেয়ে, তার কি মন চায় নাকি মাকে ফেলে একটা অচেনা সংসারে পা দিতে? কিন্তু নীরজাসুন্দরী ভেবেছিলেন অন্য কথা। ভেবেছিলেন পনেরো বৎসরের মেয়ের মধ্যে পঁচিশ বছরের একটা মন বাসা বেঁধে

রয়েছে, হয়তো সেই মন নিয়েই যমুনা কাঁদবে না। কিন্তু এখন দেখছেন ঠিক বিপরীত। মেয়েটা কেঁদে-কেটে ভাসিয়েই দিল যে।

হাটতে হাটতে ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন নীরজাসুন্দরী। সঙ্গে আরও অনেকে। নৌকো ছেড়ে গেলো। পারে দাঁড়িয়ে যমুনার ডুকরানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। দেখতে দেখতে স্রোতের টানে দৃষ্টির সীমা পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো নৌকোটা। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

ঈশানের স্ত্রী মনোরমা বলল—চল দিদি, আর কেন ?

আর কেন! হ্যাঁ আর কেন। কিন্তু কি করে বোঝাবেন সকলকে ? কোলের ওপোর লুটোপুটি করে কাঁদতে কাঁদতে ওই যে মেয়েটা বলে গেলো, বললো—এ কী করলে আমার মাগো ? সেই কথাটা কি করে ভুলবেন তিনি ? কোন উপায়ে ?

আরও একটা কথা মনে পড়ে বুক ঠেলে কান্না উপচে উঠতে চাইলো। কাঁদতে কাঁদতে যখন উঠলো মেয়েটা হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে বললো—যদি খবর পাও আমাকে লিখো।

দাগা। একেই বলে দাগা। পনেরো বছরের ওইটুকু মেয়ের মনে দাগ কেটে বসে গেছে সব। কথা বলতে পারলেন না নীরজাসুন্দরী। একবার মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা মুখ ঘুরিয়ে নিজের কান্না চাপলেন তিনি।

শত্রু, শত্রু। সাত জন্মের শত্রু। তা না হলে এমন করে না বলে-কয়ে দেশ ছেড়ে উধাও হয়ে যেতে পারলো! একটুও বাঁধল না ওর মনে! একবার বুকটা পুড়লো না যমুনার কথা মনে করে! যদি না-ই পুড়বে, যদি মমতাই না থাকবে কেন তবে মায়া বাড়িয়েছিলি শত্তুর ? কি অপরাধ মা-মেয়ে করেছিলো তোর কাছে ?

ঘরের পথে ফিরতে ফিরতে বারবার ঘাটের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন নীরজাসুন্দরী।

দিন শেষ হবার মুখে। রূপনগর ঘাটের ওপারে ডুবন্ত সূর্যের এক চিলতে লালাভ পলাশ-রঙ-ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে উঠছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

যমুনার কথা ভাবতে ভাবতেই এগুচ্ছিলেন নীরজাসুন্দরী। ওই যে মেয়েটা বলে গেল—সে ফিরলে জানাতে কিন্তু সে কি আর ফিরবে ? বেঁচে-বর্তে আছে, না অন্য কিছু হয়েছে কে বলতে পারে ?

দুই

সারা গ্রামই শুধু নয়, কয়েক মাইল এলাকা নিয়েই একটা হৈ চৈ পড়েছিলো কিছুদিন থেকে। কিন্তু কেমন যেন মিইয়ে এলো দিন পনেরোর মাথায়। অবশ্য পরম্পর শোনা যায় বড় জমিদার গিন্নী এখনও কাঁদেন। আশাও করেন যে সে ফিরে আসবে। ফিরে আসবে বিশু।

নীরজাসুন্দরীর দাওয়ায় বসে কাঁদছিলো বিশুর মা শৈলবালা। কেঁদে কেঁদে বলছিলো—আমি জানতাম গো, জানতাম। ও ঘরে থাকবার নয়। আমার ছেলে নয় ও, শত্তুর। গোড়া থেকেই জানতাম আমি। সেই মিন্সের ছাও তো, হবে না? দাগা দেবে না আমাকে? আর নয়, আর নয় মাগো। ঠাকুর দেবতাকে আর ছদ্দা-ভক্তি করবো না। ওই ঠাকুর দেবতাতেই আমার কপাল খেয়েছে।

হ্যাঁ, শৈলবালার কপাল পুড়েছে। পুড়েছে নিঃসন্দেহে। তা নইলে এমন ভাগ্যই বা তার হবে কেন।

গত দুর্ভিক্ষের বৎসর স্বামী উধাও হয়েছে। দেড় বৎসর, দু-বৎসরের মাথায় মাথায় পাঁচ পাঁচটি সন্তান। সব ক'টাই ছোট। সেই অবস্থায় রেখে দুর্ভিক্ষের বৎসরে গাঁ ছেড়ে উধাও হয়ে গেলো কেদার ভট্চাজ।

দেখতে শুনতে কী তাগড়া চেহারাই না ছিলো লোকটার। পুরো ছ ফুট লম্বা। বুকের ছাতি বিয়াল্লিশ ইঞ্চির ওপোর। একমাথা কোঁকড়ান ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কাজকর্ম তেমন কিছু নয়। গ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণ, ঘরে ঘরে পূজোপাট করে সংসার চলতো। দিনরাত ঠাকুর দেবতা নিয়েই থাকতো লোকটা। নিজের ঘরে মায়ের পূজো দিত। মা-কালী। ভারি জাগ্রত মা ছিলেন। লোকে যা কিছু মানত করুক ফলবেই ফলবে। অমাবস্যার রাত্রিতে সারারাত ভরে পূজো হতো মায়ের। লোকে বলতো—আসলে লোকটা তান্ত্রিক।

নীরজাসুন্দরীও দেখেছেন। রঙটা একটু ময়লা বটে কিন্তু সুপুরুষ সুপুরুষ চেহারা। আসনে বসে ফোলানো ঝাঁকড়া চুল ঝুলিয়ে যখন ধ্যানে বসতো, হ্যাঁ দেখবার মতই বটে। স্বামীর কাছে শুনেছিলেন অমাবস্যার রাত্রে নাকি শ্মশানে-মশানে মরা মানুষ নিয়ে কি সব করতো কেদার ভট্চাজ।

কি একটা নেশাও নাকি ছিলো। আজ স্মরণ নেই কিন্তু এইটুকু মনে আছে কিসের রসে যেন নেশা করতো। কোন গাছের রস কে বলবে?

তন্ত্র-সাধনা আর ধ্যান-ট্যান করতে করতে কেমন যেন হয়ে গেলো লোকটা। শেষদিকে বড় একটা দেখতো না ছেলেপুলেদের, স্ত্রীকে। তার মনে সে থাকতো। ক্ষণে ক্ষণে গাঁজার কল্‌কে ধরিয়ে নেশায় বুঁদ। ঘরে যে কি হচ্ছে সে দিকে নজর নেই। সেই কেদার ভট্‌চাজ অবশেষে উধাও হয়ে গেলো। একদিন সকালে রটে গেলো সে নেই।

সে বৎসর দুর্ভিক্ষ লেগেছে দেশে। ভয়ানক আক্রার বাজার। ঘরে বউ ছেলেমেয়েগুলো না খেতে পেয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খেতো কিন্তু চোখ ফিরিয়েও দেখতো না কেদার ভট্‌চাজ। কোথায় যে কি খেতো, না গাঁজার নেশায় ক্ষুধা থাকতো না কে বলতে পারে! কিন্তু দিব্যি ছিলো লোকটা। সেই জলজ্যান্ত লোকটাই হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেলো।

প্রথম প্রথম লোকে নানা কথাই বলেছে। কেউ বলেছে তন্ত্র-সাধনা কি অতই সোজা? যেমন ভালো তেমনি ভয়ঙ্কর। মন্তরের একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি আর রক্ষে নেই। অপদেবতা এসে ঘাড় মটকে দেবে, না হয় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে একেবারে সাগরের জলে চিরকালের মত বিসর্জন। কেউ বললো—শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াতো কে জানে কিসে কি হয়েছে। হয়তো শেয়াল-কুকুরে টেনে নিয়েছে, না হয় বাঘে খেয়েছে। কত লোক কত কথাই না বললো। একজন বললো—ছেলেপুলেদের ভাত দিতে পারে না সেই দুঃখে গলায় কলসী বেঁধে নদীর জলে ডুবে মরেছে।

নানা লোকে নানা কথা বললেও লোকের সেই রকমই একটা ধারণা ছিলো। দুর্ভিক্ষের বৎসর। ছেলেপুলেগুলো শাকপাতা সিদ্ধ খেয়ে বেঁচে আছে কোন রকমে। সে বাঁচাও না বাঁচারই সামিল। অথচ জীবনভর পূজো-পার্বন করে, মা-মা করে মা কালীকে ডেকে ডেকে কোন ফল না পেয়ে শেষকালে দেশত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে। চলে গেছে হয়তো হিমালয় পর্বতে।

এই অনেক কথার মধ্যে কার কথা যে সত্য কে জানে।

তবে আসল খবরটা আজোবধি এ গ্রামে পৌছোয় নি। দেলপাড়ার জেলেদের মধ্যেই বন্দী রয়েছে সব কথা। কেদার ভট্‌চাজ আসলে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন।

জেলপাড়ার জেলেদের ওদিকটায় মাঝ রাত্রিতে যাতায়াত ছিলো কেদার ভট্‌চাজের। জেলেপাড়ার শেষ দক্ষিণপ্রান্তে বৃন্দাবন জেলের বাড়ি। সে লোকটারও সন্ধান পাওয়া যায় নি একদিন। মাছ ধরতে গিয়েছিলো শেষ-রাত্রে। গেলো যে গেলোই। আর ফিরলো না। বৃন্দাবন মাঝির এই না ফিরে আসার মূলে কেদার ভট্‌চাজের কোন কারসাজি লুকানো ছিলো কিনা জানা যায় নি। তবে সে যে জলেই সাবাড় হয়ে গেছে সেই কথাটাই সকলে মেনে নিয়েছে সত্য বলে।

সেই বৃন্দাবন মাঝির বিধবা বউয়ের কাছে যাতায়াত ছিলো কেদার ভট্‌চাজের। বৃন্দাবন বেঁচে থাকতেও যে যাতায়াত না ছিলো তা নয়। এক কল্‌কের বান্ধব সুতরাং সেই হারে কি পরিমাণ ঘনিষ্টতা ছিলো এবং কি পরিমাণ যাতায়াত ছিলো সে কথা জেলেপাড়ার লোকেরাই বলতে পারে। বৃন্দাবনের আকস্মিক অন্তর্ধানের পর সেই যাতায়াত বাড়তে বাড়তে একদিন বৃন্দাবন মাঝির বউকেও পাওয়া গেলো না। এই নিয়ে কেউ আর কথাও তুললো না। নষ্ট মেয়েমানুষ বিদায় হয়েছে, ল্যাঠা চুকেবুকে গেছে সুতরাং শান্ত মাঝিপাড়া থেকে খবরটা আর রটতে পারে নি।

শৈলবালাও যে এক আধটু না বুঝতেন এমন নয়। কিন্তু ঠিক ধরতে পারেন নি। বিয়ে হয়ে আসা অবধি খুব নরমই ছিলেন। গ্রাম দেশের ভদ্রঘরের মেয়ে, সহ্য শক্তি তো রাখতেই হবে। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের টানাটানি আর স্বামীর ব্যবহারে নম্র হয়ে তিষ্টোতে পারলেন কই? মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন নি। কখনও খুনসুঁটি বাঁধলে দু-দশ কথা শোনাতেও ছাড়তেন না। পেটে খাবার জোগাড়ের পয়সা নেই অথচ তাড়ি-গাঁজাটা জোটে কোত্থেকে?

শেষ দিকে তিক্ত-বিরক্তই হয়ে উঠেছিলেন। রাত-বিরাতে ঘরে থাকবে না, ছেলেপুলেদের অসুখ-বিসুখ দেখবে না এ আবার কেমন ব্যাটাছেলে। লক্ষ্য নেই স্ত্রীর দিকে, দৃষ্টি নেই সংসারে অথচ মানুষটা দিব্যি নির্ভাবনায়, নিশ্চিন্তে রয়েছে।

কেদার ভট্‌চাজ চলে যাবার পর কত কষ্ট যে করতে হয়েছে সে খবর এ গ্রামের সকলেই জানেন কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি জানেন নীরজাসুন্দরী।

পর পর পাঁচটি সন্তান অথচ কামাই করবার লোক নেই সংসারে একটিও। ছেলেপুলেগুলো ঘুর্‌ ঘুর করতো এ বাড়ি ও বাড়ি, পাড়ায় পাড়ায়। লোকে মুঠোকুণো যা পারতো দিতো। তবে নীরজাসুন্দরীর কথা আলাদা। সব

রকমের সাহায্যই করেছেন তিনি। বিপদে আপদে এগিয়েও আসতেন। তা ছাড়া সেই শক্র, শেষকালে পালিয়ে গেলো যেটা। পাঁচটা ছেলের মধ্যে সে ছিল ঠিক বিপরীত। কেদার ভট্‌চাজ যখন পালিয়ে গেলো বিশুর বয়স তখন সাত বৎসর। পাঁচ-পাঁচটার মধ্যে ওটাই ছিলো নম্র। বাড়ি বাড়ি ঘুরঘুর করে বেড়াতো সব কটি ভাই কিন্তু সে শক্র ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকতো। কিছুতেই একমাত্র নীরজাসুন্দরীর বাড়ি ভিন্ন অন্য কোথাও যেতো না। সে না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও নয়।

প্রথম থেকেই কোলে কাঁখে নিয়ে আদর করতেন নীরজাসুন্দরী। সেই ছোট্টবেলা থেকেই। অত রূপ-রঙ্‌ আর চোখ মুখ বুঝি একমাত্র দেবপুত্র ছাড়া সম্ভব নয়। অত রূপ নিয়ে যে জন্মেছে তাকে কোলে তুলতে, আদর করতে কার না সাধ যায়? যে দেখতো, সেই-ই কোলে তুলতো। নীরজাসুন্দরীও কোলে করে নিয়ে আসতেন নিজের বাড়ি। আদর যত্ন তো বটেই, বসিয়ে এটা ওটা সেধেস্বধে খাওয়াতেন। যমুনা তখন ছোটটি।

কয়েক বৎসরের মাথায় চোখের সম্মুখে দেখতে দেখতে ওরা দুটিতেই বড় হলো একটু। দেখতে দেখতে কখন যে বেশ বড় হয়েছে ওরা, যেন খেয়ালই করেননি নীরজাসুন্দরী। সেই থেকে ছেলেটা এ বাড়িতেই মানুষ।

ওই বারান্দায় বসে হুঁকো টানতে টানতে কর্তা বলতেন—ছেলেটাকে কি বাধ্যই করেছ, একেবারে পাশটি ছাডতে চায় না।

রান্নাঘরের বারান্দায় বসে শাক-সব্জী কাটতেন নীরজাসুন্দরী অথবা অন্য কোন কাজ করতেন। চুপচাপ পাশে বসে থাকতো ছেলেটা। কর্তার কথা শুনে সেই ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ তুলে বলতেন—করবো না? ভগবানের একি বিচার তুমিই বল না। অমন রূপ দিয়ে কিনা শেষকালে পাঠালো এক হাভাতের ঘরে।

কর্তা হাসতেন, বলতেন—ভগবানের বিচার কাটায়-কাটায়। সেখানে ভুলত্রুটি হবার জো-টি নেই।

অমন যে রাশভারি গোছের লোক কর্তা, নীরজাসুন্দরী লক্ষ্য করেছেন, মাঝে মাঝে তিনিও ডেকে নিয়ে পাশে বসাতেন বিশুকে। বসিয়ে কথাবার্তা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। শহর অথবা গঞ্জ থেকে কোন একটা ভাল মন্দ জিনিস সঙ্গে করে আনলে বলতেন—দিও গো, বিশেটার জন্য একটু রেখেটেখে দিও।

দেখতে দেখতে ছেলেটা গড়নে-পিটনে দিব্বি ডাগর-ডুগর হয়ে উঠলো।

যমুনাও তখন আর ছোট্টটি নেই। সকাল সন্ধ্যায় খেতে বসলে আবাগী মেয়েটা একলা খাবে না কিছুতেই। ডাক বিশেকে, তাকে দাও, তবে মেয়ে মুখে তুলবে। অবাক হতেন নীরজাসুন্দরী, ওইটুকু একরত্তি মেয়ে তার মনেও কত বেদনা, কত টান।

গোড়া থেকেই কেমন একটা মনমরা মনমরা ভাব ছিলো ছেলেটার মধ্যে। কেমন যেন উদাস উদাস দৃষ্টি। বড় শান্ত, বড় নিথর। ঠিক যেন একটা বরফের ঢেলা। নিজের মনে নিজেই তন্ময়। ওইটুকু বয়সে কি আর ভাবনা ঢোকে নাকি মনে? কিন্তু ঠিক তাই দেখতে পেয়েছেন নীরজাসুন্দরী। ছেলেটা কি যেন ভাবতো আর কোন্ ভাবনায় যে তন্ময় হয়ে বসে থাকতো খুঁজে পেতেন না। আরও দেখেছেন কোথাও পুজা-আর্চা হলে চুপচাপ গিয়ে বসে থাকতো। বসেই থাকতো শুধু। একটু প্রসাদ তুলে দিতে যাও তা হাত পেতে নেবে না কিছুতেই।

সেই কথাই বলছেন শৈলবালা। কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—মাগো কি হবে গো আমার! অমন ছেলে তুলে দিলাম পরের হাতে। না জেনে, না শুনে পোষ্য দিলাম; ভাবলাম টাকা-পয়সা, ধন-দৌলতে যদি মন বসে কিন্তু তাও হলো না। আমার সব কেড়ে নিয়েছে ভগবান। সর্বনাশী কালী আমার সব খেয়েছে। তা নাহলে অমন ছেলে আমার সন্নিসি হয়ে হিমালয় পর্বতে চলে গেলো গো!

অমন স্বভাব চরিত্র আর রূপ দেখে গ্রামের নিঃসন্তানা বড় জমিদার গিন্নী দত্তক নিলেন বিশুকে। বংশে বাতি দেবার লোক নেই তাঁর। বড় গিন্নী আশা করেছিলেন দেওর বিলাত থেকে ফিরে এলে তাকে বিয়ে দিয়ে তারই একটা ছেলে নিজে পুষবেন কিন্তু ছোটবাবু বিলাত থেকে নিয়ে এলেন মেম-সাহেব। মামলা করে তাঁর অংশের সম্পত্তি, জমিদারী কেড়ে নিয়ে বেচে দিলেন সাতপাড়ার সাহাদের কাছে। শেষকালে নাকি সেই মেম-বৌ পালিয়ে গিয়েছে। ছোটবাবু আর দেশে ফেরেন নি। কলকাতার বাঈজী নিয়ে নাকি কি সব টকি-বায়োস্কোপ করে বেড়ায়। বিয়ে-সাদিও আর করলেন না, বড গিন্নীর সাধও মিটলো না। ওদিকে বয়স শেষ হ'য়ে এলো বড় গিন্নীর কিন্তু সন্তান-সন্ততি হ'লো না। তাই শেষকালে দত্তক নিলেন। বিশুকে দেখেছিলেন বড় গিন্নী। অমন সুন্দর চেহারা আর অমন স্বভাব-চরিত্র ক-টা বড়লোকের ঘরেই বা হয়। তাই নায়েবকে ডেকে বললেন—

আপনি একবার বলেকয়ে চেষ্টা করে দেখুন। ওরা যা চায় তাই দেবো আমি।

নায়েব চেষ্টায় লাগলো। দুর্ভিক্ষের পর কয়েক বৎসর কেটে গেছে। খাজনা-পাতি অনেকেই পরিষ্কার করে দিতে পারে নি। সেই অছিলায় নায়েব এসে উঠলো। বললো—কই গো কেদারের বৌ, ঘরে আছ নাকি ?

নায়েবকে দেখে চম্‌কেই উঠলেন শৈলবালা। কেদার ভট্‌চাজের খাজনা মাপ ছিলো তিনপুরুষ আগে থেকে কিন্তু হঠাৎ নায়েবের আগমনের কারণ খুঁজে পেলেন না। বড় ছেলে নন্দ মোড়া পেতে বসতে দিলো নায়েবকে। জাকিয়ে বসলো নায়েব। তারপর প্রসঙ্গটা তুলে বললো—জমিদারীর যা অবস্থা তাতো জানোই। আর তো চলে না কেদারের বৌ। বহুদিন তোমাদের খাজনা মাপ ছিলো কিন্তু এবার আর ওসব চলবে না, আর পারবে না জমিদার। তোমরা সকলে কিছু কিছু না দিলে জমিদারেরই বা চলে কিসে ?

শৈলবালা ঘোমটার আড়াল দিয়ে তাঁর অবস্থার কথা সবই খুলে বললেন, বললেন—আমি ছেলেপুলে নিয়ে দশ দুয়ারে ভিক্ষা করে খাই। আমি কী করে খাজনা দেবো নায়েব মশাই ?

—আমিও সেই কথাই বলছিলাম, নায়েব বললো। এতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে তুমিই বা কি করে চালাবে ? আমি বলছিলাম কি, দু একটা দিয়ে দাও না কাউকে।

শুনেও যেন শুনতে পেলেন না শৈলবালা, বললেন—কি বললেন আপনি ?

—না, বলছিলাম কেউ যদি পোষ্যটোস্য নেয় তো দু' একটাকে দিয়ে একটু পাতলা হও।

কথাটা শুনতেও বুক কাঁপে। তবু শৈলবালা বললেন—কিন্তু নেবে কে ?

—দিলে কি আর নেবার অভাব ? এই ধরো না কেন আমাদের জমিদার গিন্নীর কথাই। ছেলেপুলে তো আর নেই। আমি যদি ধরাধরি করে বলি যে, পালতে পারছে না, খাওয়াতে পারছে না তবে একটা পালতে কি আর গররাজি হবেন ? তবে হ্যাঁ, ধরাধরি করে তবে স্বীকার করাতে হবে।

হাজার হলেও মায়ের প্রাণ। শৈলবালা আকাশ পাতাল ভেবে পেলেন না। দুঃখ কষ্ট করে তবুও তো বাঁচিয়ে রেখেছেন এতদিন। বাঁচাতে পেরেছেন দুর্ভিক্ষ, রোগ-বিরোগ থেকে। কিন্তু সেই দশ মাস দশ দিন পেটে

ধর্মা সন্তান কোন প্রাণে তিনি তুলে দেবেন অন্যের হাতে? আর যাকে দেবেন সেটা যখন বড় হবে, কি-ই-বা মনে করবে সেই ছেলে।

সময় নিলেন শৈলবালা, বললেন—আমাকে দুদিন ভাবতে সময় দিন।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই নায়েব বললো। কি বলে, এতো আর সহজ ব্যাপার নয়? তা তুমি ভেবে দেখ কেদারের বৌ। আর আমিও কথাটা বলে দেখি বড়-মাকে।

সেই যে মনের মধ্যে কি বিঁধলো শৈলবালার—না পারলেন খেতে, না ঘুমুতে। দিনরাত শুধু ওই এক চিন্তা। স্বামী দেশান্তরী হবার পর থেকে কম ঝড় কি গিয়েছে নাকি? পরের বাড়ির ধান ভেনেছেন, ভেজে দিয়েছেন মুড়ি, খৈ অথবা চিড়া। তাতে যা পেয়েছেন, এদিক ওদিক করে ঠিক চলে গেছে। কিন্তু আজ সেই পেটের সন্তানকে পরের হাতে তুলে দেবার কথা ভাবতে বসে বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে তাঁর। কিন্তু শৈলবালা অনুপায়। নায়েব লোকটা বড় সুবিধার নয় তিনি জানেন কিন্তু শেষকালে ভিটে ছাড়া করলে অতগুলোকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন? নিজের মনে কত কথাই ভাবলেন। মনে মনেই যেন দিয়ে দিলেন ছোটটাকে। না, তা তিনি পারবেন না। সেজটা? না, তাও নয়। এক এক করে ভেবে দেখলেন, হাতের পাঁচটা আঙুল যদিও সমান হয় না তবুও সবগুলোই নিজের রক্তমাংস দিয়ে গড়া সন্তান। তাদের একটাকে দিয়েও শান্তি পাবেন না তিনি।

দিন তিনেক পরেই নায়েব এসে হাজির। এসে বললো—অনেক বলে কয়ে তবে স্বীকার করিয়েছি বড়-মাকে। তা, জানতো কেদারের বৌ এ হচ্ছে গিয়ে তালুকদারের ব্যাপার? যারতার ছেলে কি আর ঘরে তুলতে চায়? কথা আমি বলেছি বটে কিন্তু পাকা কথা এখনও বলতে পারিনি। তা তুমি কিছু ভেবেছ?

—পেটের সন্তান, বুঝতেই তো পারেন।

—ওই তো, ওই হচ্ছে তোমাদের নিয়ে মুস্কিল। নায়েব কৃপানাথ হালদার বললেন—খেতে পরতে দিতে পারছো না অথচ একজন যে খেয়েপরে সুখে থাকবে তাও করতে দেবে না। ভেবেচিন্তে দেখো। পোষ্য দিলেই কি আর পর হয়ে গেলো? বড় হলে কি তোমার ছেলে তোমাকে দেখবেনা নাকি? তা ছাড়া বড়-মাকে বলে তোমাদের বাঁচবার একটা রাস্তাটাস্তাও করে দিতে পারতাম।

অনেক ভেবে, চিন্তা করে শৈলবালা বললেন—সেজটাকে না হয়……

কিন্তু না, সেজ নয়। ছোট। নায়েব বললেন—দেখ কেদারের বৌ, নেহাৎ ভট্চাজ বংশ তাই না রাজি হয়েছেন বড়-মা কিন্তু জমিদারের দত্তক, ব্যাপারটা একবার বুঝে দেখো। হ্যাদা-খেঁদা দিলেই যে লুফে নেবেন সে কথা বলা যায় না। তবে ধরাধরি করেছি যখন একটাকে ঠিক গছিয়ে-টছিয়ে তোমাদের একটা মাসোহারার ব্যবস্থা না হয় করা যাবে। তাই বলছিলাম —ছোটটাকেই দিও। ওকে দিলে আর গররাজি হতে পারবেন না।

ছোটটি! যেন আঁত্‌কে উঠলেন শৈলবালা। পাঁচ-পাঁচটা ছেলের মধ্যে ওটাই দেখতে শুনতে একেবারে দেবপুত্রের মত। শেষের কিনা, তাই বড় আদরের, বড় সোহাগের। শেষকালে তাকেই ধরে টানাটানি করছেন বড় জমিদার গিন্নী! তার চেয়ে শৈলবালার কলজেটা যদি সদ্য উপ্‌ড়ে নিতেন হয়তো কোন দুঃখ থাকতো না শৈলবালার। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। নায়েবের কথাটা শোনা অবধি গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল একেবারে।

অনেক ভেবেছেন শৈলবালা। তাঁর সংসারে অভাব লেগেই আছে। বড় ছেলে নন্দ আজকাল বাড়ি বাড়ি পুজো-আর্চা করে কিছু কিছু পায়। অন্যান্যগুলো এখনও ছোট। কাজকর্ম করবার মত বয়স হয়নি একটারও।

শেষকালে রাজি হলেন শৈলবালা। না হয়েই বা উপায় কী? জমিদারের ব্যাপার—শেষকালে ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন না করে দেয়। তা ছাড়া ছেলেটা যদি লেখাপড়া শিখেটিখে মানুষ হয়, এই ভাবভোলা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাবটা টাকা পয়সা দেখে যদি কমে। ছেলে সুখে থাকবে তো বটেই তা ছাড়া জমিদারী থেকে মাসে মাসে মাসোহারা বাবদ যা পাওয়া যাবে তাতে সংসার চলে যাবে। বাকি চারটাকে নিয়ে খেয়ে বাঁচবেন তিনি।

নীরজাসুন্দরীর আজও মনে আছে সেই কথাগুলো, সেই পোষ্য নেবার ঘটা।

শৈলবালা কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে পড়ছে। এই পনেরোটি দিন যত অশ্রু ক্ষয়িত হয়েছে তাঁর তা দিয়ে সমুদ্র গড়ে উঠতে পারতো অনায়াসে। কেঁদে কেঁদে শৈলবালা বলছেন—আমি জানতাম গো মা, ও সন্ন্যিসি হবে। সংসার ওকে বেঁধে রাখতে পারবে না কোনদিন।

—না মা, না। তুমি শুধুই দুঃখ করছো। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন

নীরজাসুন্দরী। ওই একরত্তি ছেলে, কদিন বাইরে থাকবে? ঠিক চলে আসবে। দেখো তুমি, ঠিক আসবে।

ও কথায় সান্ত্বনা পেলেন না শৈলবালা। বরং কান্নার বেগ যেন উথলে উঠলো। হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করলেন তিনি, বললেন—টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত যাকে রাখতে পারলো না, সে কি আর আসে? না গো, সে আর আসবে না। সে শত্তুর আর দেখা দেবে না।

নীরজাসুন্দরীর মনে পড়ছে—কি ঘটা করেই না বড়-মা পোষ্য নিয়েছিলেন বিশুকে। পূজো-আর্চা করে, লোক খাইয়ে সে-কি ঘটা! বাবা—বাবা, বিয়ে সাদিতেও অমন ঘটার বহর কোনদিন দেখেন নি নীরজাসুন্দরী। শহর থেকে এলো ইংরাজী বাদ্য, কলকাতা থেকে ছেলের জামা-কাপড়। ফল-ফলাদি, মিষ্টি-দই-রাবড়ী কিছুই বাকি নেই। তিন গ্রামের সমস্ত লোক খেলো। বামুনরা সব নগদে জিনিসে বড় বড় কাপড়ের পুঁটলী বাঁধলো। সে একটা কী ঘটাই না হয়েছিলো!

কথা আর কান্নাকাটিতে সন্ধ্যে হয়ে এলো। নীরজাসুন্দরী হাঁক দিলেন—কই লো কেষ্টর মা, বলি বাতিটাতি দিবি তো, না সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত বসে থাকবো আমরা?

বারান্দার খুঁটি ধরে এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যমুনা। মায়ের ডাকে তার টনক নড়লো। সে ছুটে গেলো আলো আনতে।

নীরজাসুন্দরী বললেন—কেঁদো না, কেঁদোনা মা; সাঁঝ-সন্ধ্যেয় কান্নাকাটি অমঙ্গলের চিহ্ন। চিন্তার কি আছে? ঠিক জেনো, আমি বলছি সে আসবে।

আসবে! লণ্ঠন হাতে থমকে দাঁড়ালো যমুনা ঠিক পৈঠার ওপোর। মনে মনেই বললো—হ্যাঁ, তাই যেন হয়, তাই যেন হয় ভগবান!

অষ্টমঙ্গলের ফিরতি এসেছে যমুনা। দিন ছয়েক আগেই এসেছে। নিয়ে আসবার তো লোক নেই, তাই জামাইকে বলে দিয়েছিলেন নীরজাসুন্দরী। বিয়ের সময় ঈশান ছিলো বটে কিন্তু তার চাকরি মহাজনের গদীতে। কামাই করবার উপায় নেই তার। বউটাকে অবশ্য রেখে দিয়েছেন নীরজাসুন্দরী। সত্যিই তো, এ সময় আত্মীয়-টাত্মীয় গোছের একজন নিজের লোক না হলেই বা চলে কি করে।

অষ্টমঙ্গলের ফিরতি যে দিন ওরা এলো, আবার সেই আশীর্বাদের পালা।

ভাল করে মেয়েকে দেখলেন নীরজাসুন্দরী। এই কদিনে যমুনা কেমন যেন রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অমন সোনার মেয়ের দেহে-গতরে ম্লানিমা নেমেছে। কেমন চুপ্‌সে গেছে সেই ভরাট মুখখানা। বিবর্ণ হয়ে গেছে।

জামাই এসেছে, আদরযত্নের ত্রুটি রাখলে চলবে কেন? সারাটা দুপুর হাঁকেডাকে বাড়ি মাতিয়ে রাখলেন। ঘনঘন এসে বসলেন মেয়ের কাছে, ডাকলেন কেষ্টর মা-কে, মনোরমাকে। নিজের হাতে দইয়ের সরবৎ করে জামাইকে খাওয়ালেন। তারপর সাধতে বসলেন মেয়েকে।

ওই একটা ছুতো পেয়েছেন নীরজাসুন্দরী। সরাসরি কথাগুলো বলতে কেমন যেন বাধবাধ লাগছিলো। মিষ্টি এনেছিলেন বাজার থেকে। জামাইকে দিয়েও কয়েকটা পড়ে রয়েছে তার। তা থেকে খান দুই সন্দেশ আর গোটা চারেক রসগোল্লা বাটিতে করে এনে মেয়ের পাশে বসলেন সুস্থির হয়ে, বললেন—নে মা, খেয়ে নে। অতখানি পথ নৌকায় এলি, পরিচ্ছম তো আর কম হয়নি?

খাওয়ার নাম নেই মেয়ের! হয়তো এতক্ষণ উস্‌খুস্ করছিলো মনটা, মাকে পেয়ে যেন একটু স্বস্তিই পেলো যমুনা। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—খবর কিছু পাওয়া গেছে মা?

—কিসের খবর!

কিসের খবর! এরই মধ্যে কি তাহ'লে ভুলে গেছে মা। অবাক হলো যমুনা। কিন্তু এরপর কী-বলবে সে? সোজাসুজি নামটাই করে বসবে নাকি? না। কেমন যেন একটা সঙ্কোচের কাঁটা খচ্-খচ্ করে বিঁধলো। না, নাম সে করতে পারবে না। সত্যিই অবাক লাগে যমুনার, অবাক লাগে এই ভেবে যে, বিয়ের এই বন্ধনের মধ্যে মেয়েরা কত অসহায়! রামের অনুপস্থিতিতে লক্ষ্মণ যেমন দাগ কেটে দিয়ে সীতাকে বলেছিলো তার বাইরে না যেতে, তার চেয়ে এই বিয়ের বন্ধন যেন আরও কঠিন। গণ্ডি পার হয়ে ভিক্ষা দিতে এসেছিলো বলেই না রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে যেতে পেরেছিলো। বিয়ের বন্ধনটাও একটা গণ্ডি। আর সেই গণ্ডির সংস্কার এ দেশের প্রত্যেকটি মেয়েমানুষের মনে, সমাজে, লোকজনের মধ্যে। মেপে কথা বলো। হিসাব করে এগোও। একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি সকলে সন্দেহ করবে, না হয় বলবে—মেয়েটা কী বেহায়া বাবা, বিয়ের পরও ছোঁড়াটাকে ভুলতে পারছে না।

সেই ভয়টাই যমুনার মনে মোচড় দিয়ে উঠলো। অমন যে মা, সংসারে যাঁর চেয়ে আপন কেউ নেই। যার কাছে সন্তান চিরকালই সন্তান, চিরকালের কিশোর, তাঁর কাছেও যে বিয়ের পর সব কথা বলা চলে না এই প্রথম বুঝতে পারলো যমুনা। বুঝতে পারলো কুমারী জীবনের যত জ্বালা, যত বেদনা সব নিজে নিজে বয়ে বেড়াতে হবে সমস্ত বাকি জীবন ধরে। কারও কাছে মুখ খুলে, প্রাণখুলে কিছু বলে যে মনে একটু শান্তি পাবে তারও কোন উপায় নেই। যে সমাজের মধ্যে মা বড় হয়েছেন, বুড়ো হতে চলেছেন—তাঁর কাছে এ প্রসঙ্গ না তোলাই বাঞ্ছনীয়। বললে হয়তো এই মা-ই মনে করবেন, ভাববেন মেয়ে তার বিয়ের জীবনকে স্বীকার করে নিতে পারে নি, গ্রহণ করতে শেখে নি। তা নইলে পর-পুরুষের কথা বিয়ের পরও কি কোন মেয়ে চিন্তা করতে পারে নাকি!

কিন্তু কত আর বয়স হয়েছে যমুনার? এই তো বুঝি পনেরো চলছে। পনেরো হ'লেও যমুনা যে পঁচিশ বছরের মন পেয়েছে। তা নইলে বিশুর জন্য বিয়ের কদিন আগে অমন করে না খেয়ে, না দেয়ে নির্জলা উপোষ করে তিন তিনটা দিন কাটিয়ে দিতে পেরেছিলো কেমন করে! বাঙ্গলা দেশের প্রবাদ অনুযায়ী মেয়েরা যদি কুড়িতেই বুড়ি, যমুনা তো তা হ'লে বুড়িয়েই এলো।

আসলে তাও নয়। বাঙ্গলা দেশের ধরণ ধারণই এই। এগারো-বারোয় এ দেশের মেয়েরা যৌবনে পা দেয়। তেরোয় সব বুঝতে শেখে। চৌদ্দ-পনেরোয় তারা পুরো একটা সংসারের ঝক্কি কাঁধে নিয়ে সব রকম স্থনীতি-কূটনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে যমুনার মত পনেরো বৎসরের একটা মেয়ের মনে পঁচিশ বৎসর ভর করবে না কেন? এ ছাড়াও যেটুকু অজ্ঞতা থাকে, বাকি থাকে জানবার, ঠিক বিয়ের পর সে অজ্ঞতাটুকুও ঘুচে যায়। তখন সবই বুঝতে শেখে, জানতে পারে মেয়েরা।

কিন্তু তবুও যমুনা ভাবলো বলবে, মা-কে জিজ্ঞাসা করবে। নাম ধরে নয়, জমিদার বাড়ির প্রসঙ্গ তুলে ঘুরিয়ে জেনে নেবে সে আসল সংবাদটা।

মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে এতক্ষণে ব্যাপারটা সব বুঝতে পেরেছেন নীরজাসুন্দরী। কিন্তু তারও কেমন যেন একটা সঙ্কোচ। কেন যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না।

কেষ্টর মা আর মনোরমা দাঁড়িয়েছিলো পাশে। মা-মেয়ের ভাব-গতিক দেখে কেষ্টর মা আর তিষ্ঠোতে পারল না—মা-মেয়ে যে চুপচাপ বড় বসে

রইলে? তারপর নীরজাসুন্দরীকে উদ্দেশ্য করে বললো—কই মা, মেয়েকে খাওয়াও?

—ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ! যেন চমকে উঠলেন নীরজাসুন্দরী, বললেন—নে মা, খেয়ে নেতো। এইতো এইটুকু খাবার।

সরবতের গ্লাশটা তুলে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা খেয়ে নিলো যমুনা কিন্তু পুরোটা নয়।

নীরজাসুন্দরী বললেন—সে কি! মিষ্টিটুকু খেয়ে ফেল।

—না-মা।

—এই দেখো। এতটা পথ কষ্ট করে এলি, একটা কিছু মুখে দে।

ঈশানচন্দের বউ মনোরমা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো, এবার এসে পাশে বসলো, বললো—নাও যমুনা, খেয়ে নাও। এতো আর তোমার শ্বশুরবাড়ি নয়, বাপের বাড়ি। এখানে লজ্জা কিসের?

—না কাকিমা, তার জন্য নয়। একেবারে ক্ষুধা নেই আমার।

—তাই বলে মায়ের হাতের জিনিস ফেলে দেবে?

শেষে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর দুখানা সন্দেশ মুখে পুরলো যমুনা।

নীরজাসুন্দরীর মনে তখনও মেয়ের কথাটা অনুরণন তুলছিলো। খবর জানতে চাইছে মেয়ে। কিন্তু কী করে কথাটা তুলবেন তাই ভাবছিলেন। সন্দেশ দুটো, আর একঢোক জল খেয়ে গ্লাশটা নামিয়ে রাখলো যমুনা। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে, মস্ত করে এবার কথাটা বললেন নীরজাসুন্দরী, বললেন—বিশের মা-টা পাগলের মত হয়ে গেছে রে।

—এঁ্যা! চমকে উঠলো যমুনা, তাই নাকি?

অবাক হবার চেয়েও খুশি হলো যমুনা। খুশি হলো এই ভেবে যে, কথাটার সূত্র উঠেছে। ·এইবার সমস্ত সংবাদ সে জানতে পারবে। কিন্তু ওর মনে একটা ভয়ের ইঙ্গিত দুলছিলো। কিসে কী শুনতে পাবে সেই ভয়। অবশেষে ও বললো—ছেলে বুঝি ফেরেনি এখনও?

—না।

সহসা সমস্ত মুখে যেন কালি ছড়িয়ে পড়লো যমুনার। আর কোন কথা নয়। মা-মেয়ে দুজনেই ঠিক আগের মত নিঃশব্দে মুখোমুখি বসে রইলো।

যমুনা ভেবেছিলো—সে ফিরেছে। এতদিনে নিশ্চয়ই সে ফিরে এসেছে গ্রামে। কোথায় যাবে? বাইরে অথবা বিদেশে কোথাও না আছে

আত্মীয়-স্বজন, না কোন জানাচেনা লোক। এমন অবস্থায় কোথায় গিয়ে কদিন থাকবে? ঠিক ফিরে আসবে। আসবার পথে সেই কথাটাই সারাক্ষণ মনে পড়েছে ওর, মনে হয়েছে—গিয়ে হয়তো দেখবে অথবা জানতে পারবে সে ফিরে এসেছে। দেখা না হোক, ফিরে এলেও শান্তি। কিন্তু এই মুহূর্তে সব যেন হাওয়ার মত উড়ে গেলো।

কিন্তু কেন গেলো, এ প্রশ্নের মীমাংসা হলো না। এই একুশটা দিনের প্রতিটি মুহূর্তে যে মীমাংসা নিজের মনে খুঁজেখুঁজে হয়রান হয়েছে যমুনা আজও তার কোন ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত ও আবিষ্কার করতে পারে নি। কী হয়েছিলো তার? কার ওপোর রাগ করে, না বলে, না কয়ে এমন করে চলে গেলো লোকটা! কী দুঃখ, কোন বেদনায় আহত মন নিয়ে এমন করে দেশান্তরী হতে পারলো! তবে কি তার ওপরেই অভিমান করেছে—ভাবলো যমুনা। কিছুই বলা যায় না। কিন্তু যমুনা তো কোন অপরাধ করে নি। শুধু অবুঝ মন কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিলো না স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়। অবুঝের মতই বুঝি আব্দার করেছিলো সে।

আর একটা সন্দেহও কাঁটার সম্ভাবনায় খচখচ করে নিরঙ্কুশ বেদনায় বিঁধে বিঁধে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে যমুনার মন। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, এই চলে যাওয়ার পেছনে আর কারও কি চক্রান্ত ছিলো? হয়তো ছিলো। তা নইলে এমন অনায়াসে কি করে না বলে, না কয়ে চলে যেতে পারলো? ওই সন্দেহটা যতবার মনে হয়েছে যমুনার, ও তাকাতে পারে নি, তাকাতে পারেনি সরাসরি মা-র মুখের দিকে। কেন যে ওর মনে এমন হয় ও নিজেই ভাবতে পারে না। কিন্তু তাই যদি সত্য হয়, তবে?

অলোটা এনে দাওয়ার ওপর রাখলো যমুনা। দেখলো বিশুর মায়ের কপালে চোখের পরিবর্তে যেন একজোড়া রক্তজবা ফুটে রয়েছে।

নীরজাসুন্দরীর কথায় কিনা বলা যায় না, সেই থেকে শৈলবালা নীরব হয়ে গেছেন। চুপচাপ বসেছিলেন এতক্ষণ। অলোর মুখ দেখে আবার ভাঙা গলা খুললেন তিনি। কিন্তু এবার আর কান্না নয়, কাঁপাকাঁপা ভাঙা কণ্ঠস্বরে খেদোক্তি মাত্র।

সহ্য করতে পারছিলেন না নীরজাসুন্দরী। ব্যথাটা কি তাঁর মনেই কিছু কম লেগেছে নাকি? বিশুর চেহারাটা তাঁর চোখের সম্মুখে স্পষ্টতম হয়ে রয়েছে। কিন্তু শুনতেই হবে। বুকটা ফেটে চৌচির হতে চাইছিলো তবুও

শক্ত হয়ে বসে রয়েছেন তিনি। বসে বসে দেখছিলেন বারান্দার খুঁটি ধরে আবার দাঁড়িয়েছে যমুনা। নিশ্চল বিমূঢ়তায় স্থাণুর মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে। কোন্ একটা কাজের অছিলায় ওকে ওখান থেকে সরিয়ে দেবেন সে কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করছিলেন। এ সব শুনলে কি আর মেয়েটা স্থির থাকতে পারবে নাকি? না, পারবে না। নীরজাসুন্দরী সে কথা জানেন, বোঝেন ভাল করেই।

বেশিক্ষণ এ কষ্ট সহ্য করতে হলো না। শৈলবালার সেজছেলে মুকুন্দ এসে উপস্থিত হলো লণ্ঠন হাতে। রাত হয়েছে, মাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন ছেলে।

শৈলবালার সংসারে এখন আর মালিন্য নেই। বড় ছেলে পূজো-আর্চা ক'রে যজমানদের ঘর থেকে মন্দ কামাই করে না। মেজ আর সেজটা মহাজনের দোকানে কাজ করে। ওদের ছোটটা স্কুলে পড়ে।

তিন ছেলের কামাই দিয়ে সংসারের খানিকটা স্বচ্ছলতা অন্ততঃ ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন শৈলবালা। ছেলেগুলোও একেবারে মা-অন্ত প্রাণ। ওরা বড় হ'য়ে না পেল বাপের আদর, না পেল তাঁর কাছে ঘেঁষতে। তারপর যখন সে মিন্সেটা পালালো, সেই থেকে ওরা তো শৈলবালাকেই চিনেছে। চিনেছে মা-কে। মা-ই বলো আর বাবাই বলো সবই ওই এক শৈলবালা।

ইদানীং নন্দর বিয়ের একটা সম্বন্ধ হয়েছে। কথাবার্তা চলছে এখনও। ছেলে ডাগর হয়েছে, কামাই করছে, বিয়ে করবার সময় তো এখনই। এ সংসারে আসবার পর থেকে একটা দিনের জন্যেও শান্তি পান নি শৈলবালা। নন্দকে বিয়ে করিয়ে বউ ঘরে এনে যদি একটু রেহাই পান। ছেলের বিয়ে সম্পর্কে শৈলবালার গরজ একটু বেশিই। কেদার ভট্‌চাজ চলে যাবার পর এসব কথা মনে আসেনি। জমিদার বাড়ি থেকে যা পাওয়া যায় তাতেই কষ্ট করে চালালে চলে যায়। উপরি যখন ছেলেগুলো এক এক করে কামাই করতে লাগলো, সেই সময়েই বড় ছেলে নন্দর বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন শৈলবালা। ওই একটা ভয়। যে সংসারের কর্তা সব মোহ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতে পারলো—তারই তো ছেলে। ওরা আবার শেষ পর্যন্ত কিসে কি করে বসে কে জানে? তবু বড়টাকে বিয়ে-টিয়ে দিয়ে যদি সংসারে বাঁধতে পারেন।

ছোটটাকে তো নিজেই বিসর্জন দিয়েছেন। বলতে গেলে ওই পেটের জ্বালাতেই। তা নইলে কি সংসার চলতো না? ঠিকই চলতো। মাঝখান

থেকে জলজ্যান্ত ছেলেটা পর হয়ে গেলো। কিন্তু এমন করে, এতটা যে পর হয়ে যাবে সে দিন কি বুঝতে পেরেছিলেন সে কথা? বুঝতে পারলে কি আর তুলে দিতে পারতেন নাকি? না, দিতেন পরের হাতে?

বিশু তখন আর ভট্চাজ নয়, বিশ্বনাথ চৌধুরী। গোটা জমিদারীর ভাবী মালিক। কত রকমের দামীদামী পোষাক-আসাক! হাতে হাতঘড়ি, দশ আঙ্গুলে সাতটা আংটি ঝকমক্ করছে। সোনার বোতাম, কলকাতা থেকে এলো দামী আলোয়ালা সাইকেল। তাতেই চড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। খবর পেতেন শৈলবালা। ছেলেরা এসে বলতো, গাঁয়ের বাজারে কত পয়সাই নাকি ওড়ায় সে। মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান সবখানে। ভিখিরী টিকিরি কেউ পয়সা চাইলে গোটা টাকাটাই নাকি তুলে দেয়।

শুনতে শুনতে অবাক হয়েছেন শৈলবালা। তাঁর অবস্থা ইদানীং একটু ভালো হলেও এমন স্বচ্ছলতা আর কী? কিন্তু ছেলেটা কি দু-দশটা টাকা পয়সাও এদিকওদিক করতে পারে না? হাজার হলেও মা আর ভাইরা, তাদের জন্য কি একটুও মায়া নেই ছেলেটার! তা অত পয়সা তো এদিক ওদিক করছিস বাজে বাজে—না হয় কিছুকিছু দে।

টাকা দেওয়া দূরে থাক, এ পথই মাড়ায় না বিশু। যদিও এ পথে পড়ে না স্কুল বা বাজার। পড়ে না দিঘী, বাগান তবুও প্রাণের টান তো মানুষের থাকেই। না হয় সেই টানেই দু একদিন অন্ততঃ আয়! কিন্তু না, সেই যে হোম-যজ্ঞি করে অন্যের হাতে তুলে দিলেন, সেই থেকেই ছেলেটা পর হয়ে গেলো। আগে ভাবতেন শৈলবালা, হয়তো জমিদারগিন্নীরই কাজ এটা, সে-ই হয়তো শিখিয়ে পড়িয়ে ছেলেটাকে অমন করেছে। কিন্তু সে ভুলও ভেঙ্গেছে। ছেলের টান না থাকতে পারে কিন্তু মায়ের প্রাণ তো আর তাই বলে নিরস্ত থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে যেতেন শৈলবালা। কিন্তু তাকে দেখে সেই যে লুকোতো ছেলে আর কাছে আসবার নামটি নেই। জোর-জবরদস্তি টেনে আনতে বলতেন বড়-গিন্নী। কিন্তু ছেলে রেগে সব ভেঙেচুরে অস্থির করে তুলতো।

ছেলেদের মুখে মাঝে মাঝে শুনতেন শৈলবালা, শুনতেন বিশুর কথা। ওরা বলে—রাস্তাঘাটে যদি কখনও দেখা হয় ওদের সঙ্গে, পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একেবারে দাঁড়াতে চায় না।

শৈলবালা বললেন—তা তোরা ডাকলেই তো পারিস।

নন্দ বললো—সে কি আর বাকি রেখেছি, কিন্তু শুনতেই পায় না।

সেজোর ছোটটার সঙ্গে স্কুলে দেখা হতো। বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে কত হৈ-চৈ করে সব টিফিন খায় কিন্তু মায়ের পেটের ভাইকে সেখানে কখনও দেখলে ডাকে না।

ছেলের তাগাদা পেয়ে এবার উঠে পড়লেন শৈলবালা। উঠে বললেন—যাই গো মা, যাই।

—হ্যাঁ, আসো। নীরজাসুন্দরী বললেন—ও সব মনে রেখো না। কি লাভ? যে যাবার তাকে কি আটকে রাখা যায় মা?

—তাই তো ভাবছি, ভগ্নকণ্ঠস্বরে হাসফাঁস করে বললেন শৈলবালা, কিন্তু মন যে মানে না। তা নইলে অমন সাতজন্মের শত্তুরের কথা কি মুখেই আনতাম?

তিন

যমুনা যখন শুতে এলো, রাত তখন প্রায় বারোটা। এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে গুনীন অপেক্ষা করছিলো যমুনার জন্য। অপেক্ষা করতে করতে কখন যে ঘুম নেমে এসেছে দু'চোখের পাতায় নিজেই জানে না। ঘরের লণ্ঠনটা ঠিক তেমনি জ্বলছে।

বাপের বাড়ি এসেও স্বামীর কাছে শুতে হবে এটা যমুনা মানতে চায় নি। গতকাল এই নিয়ে খানিক কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। কান্নাকাটিও হয়েছে। ওরা যেদিন এসে পৌছলো অর্থাৎ গত কাল সন্ধ্যেবেলায়, মা-র হুকুমে দক্ষিণের ঘর থেকে বিছানা পত্র তুলে নিয়ে মনোরমা-কাকিমা চলে গেল মা-র ঘরে। কেষ্টর মা ঘরটাকে ঝাড়মোছ করে পরিষ্কার করলো আর মনোরমা-কাকিমা এসে বিছানাপত্র পেতে দিয়ে গেলো।

খাওয়া দাওয়া সেরে খানিকক্ষণ গল্প-গুজব হলো। তারপর নীরজাসুন্দরীই তাড়া দিলেন, বললেন—যা মা, এবার শুতে যা। অনেক রাত হয়েছে।

—আমি তোমার কাছে শোব, যমুনা বললো।

—সে কি! অবাক হলেন নীরজাসুন্দরী মেয়ের কথা শুনে।

—হ্যাঁ।

—তাকি হয়? একলা একলা ওঘরে জামাই পড়ে থাকবে যে।

—থাক। আমি তোমার কাছে শোব।

কথা শুনে নীরজাসুন্দরী অবাক। মেয়ের একগুঁয়েমী স্বভাবটা একটুও কমেনি। ঠিক সেই রকমটিই রয়েছে যমুনা। জামাই এসেছে শ্বশুর বাড়ি, আজ মেয়ে যদি তার কাছে না শুয়ে এখানে শোয়, ওই ঘরটাতে একলা একলা কি করে থাকবে জামাই?

নীরজাসুন্দরী বললেন—ছিঃ! অবুঝের মত কথা বলে না মা। জামাই মানুষ, আদর-যত্ন তো তেমন করতে পারি না, তার উপর তুই যদি না শোস জামায়ের মনে রাগ হবে না?

—হলোই বা। এইতো মাত্র দুটো দিন। তারপর তো চলেই যাবে।

—হ্যাঁ, দুদিন বাদে তো চলেই যাবে। এই দুটো দিন তুই যা। তারপর আমার কাছে কত শুতে পারবি। উল্টো বোঝাতে চাইলেন নীরজাসুন্দরী।

কিন্তু বোঝাতে চাইলেই কি বোঝে মেয়ে? তার ওই এক গোঁ। কত বললেন, বোঝালেন কিন্তু মেয়ে নড়বার নামটি পর্যন্ত করে না। গো ধরে রইলো তো রইলোই।

নীরজাসুন্দরী বললেন—বিয়ে-থা না হলে তবু একটা কথা ছিলো। এখন আমার চেয়ে তোর স্বামীর অধিকারই তো বেশি। বিয়ে হয়ে গেলে তাই হয়। তা ছাড়া এ সব ভাল কথা নয় মা। যাও শোওগে।

কি যে বুঝলো মেয়ে হঠাত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। যেন কেউ ওকে দুটো শক্ত কথাই শুনিয়েছে। কেষ্টর মা বললো, মনোরমা বোঝালো কিন্তু কার কথা কে শোনে? সেই যে কান্না সুরু করলো আর থামতে চায় না। বিপদ গণলেন নীরজাসুন্দরী। মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা। বাবা বাবা! এমন একগুঁয়ে মেয়ে আর জীবনে দেখেন নি তিনি!

আবার বুঝি বলতে গিয়েছিলেন—মেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আমি তোমার শত্রু হয়ে গেছি? বেশ।

কথাটা শোনো একবার মেয়ের! কেষ্টর মা আর মনোরমার মুখের দিকে তাকালেন নীরজাসুন্দরী। তিনি আবার কখন বললেন যে, মেয়ে তাঁর পর হয়ে গেছে! এমনভাবে ওদের দিকে তাকালেন, যেন মনে মনে বলতে চাইলেন—দেখ, তোরাই বিচার কর, মেয়েকে অন্যায় কথাটা আবার কখন বললাম আমি। দশমাস দশদিন পেটে ধরেছিলাম কি শত্তুর হবার জন্যে? কিন্তু ওরা দুজন নীরজাসুন্দরীর মনের ভাষা বুঝলো কিনা ভগবান জানেন! যেমন ছিলো, তেমনিই চুপচাপ রইলো।

দক্ষিণদুয়ারী ঘরের দরজাটা বন্ধ করার শব্দ কানে এলো। এবার আর না হেসে থাকতে পারলেন না নীরজাসুন্দরী। কেষ্টর মা আর মনোরমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললেন—দেখলি মেয়ের গোখানা একবার?

কেষ্টর মা-র অভ্যাস মুখের ওপোর কাটাকাটা উত্তর দেওয়া। ও সব রয়ে-সয়ে কথার বলার মধ্যে সে নেই। যা বলবে সাফসুফ স্পষ্ট কথা। সে বললো—তোমার নাই পেয়েই তো এমনটি।

—না কেষ্টর মা, মেয়েকে আমি লাই দিইনি কখনও। ও কথা কেউ বলতে পরবে না। আসলে ওটা ওর স্বভাব।

—স্বভাব না, ছাই। কেষ্টর মা সরোজিনী বললো—এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড তো বাপের জন্মে শুনিনি! মেয়ে তার সোয়ামী ফেলে মায়ের কাছে

শোবে এমন আদিখ্যেতা তোমরাই দেখালে মা। ভূ-ভারতেও এমন কাণ্ড দেখিনি।

—দেখিসনি তো? দেখ এইবার, হাসতে হাসতে নীরজাসুন্দরী বললেন।

—দেখে আমার দরকার নেই।

—আহা! শোনই না লো, নীরজাসুন্দরী হাসতে হাসতে বললেন—আচ্ছা, সেই শুতেই তো গেলি, তার অতসব কাণ্ড বাঁধাবার কি দরকারটা ছিলো? ভালোই হয়েছে, রাগ না লক্ষ্মী।

এত সব কথা অবশ্য শোনেনি যমুনা। শুনবার কথাও নয় তার। দক্ষিণের ঘর থেকে কি আর পূবের ঘরের কথা শোনা যায়? মা-র ওপোর রাগ করে এসে সরাসরি ও ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

মায়ের কাছে শোবার অভ্যাস এমন কিছু নূতন নয়। ছোট থেকে এত বড়টি হয়েছে যমুনা মায়ের কাছে শুয়ে বসে। আজ না হয় একটু শুতোই, তাতে এমন কি আর ক্ষতি হতো? অথচ ঈশানকাকার বৌকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়েছেন মা। ওই ঘরেই সে শোবে। যমুনার মনে হলো যেখানে ওর এতদিনকার একচ্ছত্র অধিকার সেখানে বুঝি মনোরমা-কাকিমা গিয়ে বসলো। অধিকার করে নিলো যমুনার জায়গাটা। অথচ মনোরমা যদি তার বিছানা নিয়ে যমুনার চোখের সামনে ওঘরে না যেতো, তা হ'লে হয়তো এতটা অভিমান হতো না যমুনার। এই সব ভেবে, দুঃখে ওর কান্না পাচ্ছিলো।

স্বামীর ঘরে যাওয়া অবধি ওই অচেনা লোকটার কাছেই তো এতগুলো দিন শুতে হয়েছে। ঠিক ভয় না হলেও কেমন যেন একটা সঙ্কোচ। সেই সঙ্কোচে একটু যে সরেটরে শুয়ে ঘুমোবে তার উপায় নেই। আলোটা নিভবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা স'রেসরে আসবে। গা ঘেঁষে শুইবে। ওর মধ্যে কি ঘুম হয় নাকি কারো? কোনদিন যাকে দেখেনি, সেই অচেনা পুরুষের সঙ্গে গা ঘেঁষে শুলে কার না বিরক্তি লাগে?

শ্বশুর বাড়ি পা দিয়ে যমুনা দেখলো, একেবারে একলার সংসার। কোথা থেকে কে জানে, গুনীনের এক বুড়ি পিসিমা এসেছেন। তিনিই বরণ করে নিলেন, আশীর্বাদ করলেন। ঘোমটা তুলে বললেন—বাঃ! এ যে একেবারে লক্ষ্মী ঠাকরুণ গো।

লজ্জা একটু লেগেছিল যমুনার। লাগবারই কথা। আরো লোকজন ছিলো সেখানে। সব পাড়াপড়শী। তাদের সামনে অমন কথা শুনলে কার

মুখে না আবির ছড়িয়ে পড়ে ? তবুও, মুখে একটু রক্তিম ছটা ফুটে উঠলেও ওযে খুশি হয়নি এমন কথা নয়। শ্বশুরবাড়ী পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এমন রূপের প্রশংসা শুনলে অনেক মেয়ের বুকটাই গর্বে ফুলে ওঠে।

রাত্রিবেলা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিলো যমুনা। যখন ঘুম ভাঙলো চমকে উঠলো ও। পাশে কে! কে তাকে অমন করে জাপটে ধরেছে! ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো যমুনা। কি একটা কথা যেন কানে এলো ওর। ফিস্‌ফিসে কণ্ঠের পুরো কথাটা শোনাও হলো না। আবার কথাটা শুনলো। এবার একটু স্পষ্ট যেন। বুঝতে আর বাকি নেই যমুনার, কে তাকে অমন করে দু বাহুর ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী করেছে, কথা বলছে।

—ভয় পেয়েছ বুঝি ? অস্পষ্ট কণ্ঠে বললো গুনীন।

যমুনা কথা বললো না।

—রাগ করলে ?

তবুও নিশ্চুপ যমুনা।

কিন্তু তাই বলে সরে গেল না গুনীন। বরং মুখটা যমুনার কানের কাছে এনে বললো—আজ থেকে তুমি আমার। একটা আশ্চর্য মাদকতায় নেশাগ্রস্তের মত বললো গুনীন।

তুমি আমার, এ কথাটা গুনীনের মুখে শুনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগলো যমুনার। এমন কথা ছোটবেলায় ও শুনেছে। শুনেছে আরও দু বছর আগে একজনের কাছে। তাই গুনীনের মুখে আজ এই মুহূর্তে ও কথাটা কেমন যেন বেতাল বলে মনে হলো ওর। সেদিনকার সেই লোকটার স্বরের সঙ্গে আজকের এই গুনীনের স্বরের অনেক পার্থক্য। একটা ভাবে-সোহাগে ডগমগ আরেকটাতে কেমন যেন একটা অধিকার এবং দাবীর গন্ধ।

তারপর আরও কথা, আরো অনেক গল্প। সব কথার উত্তর দেয়নি যমুনা। আসলে একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে বলীয়ান পুরুষের বক্ষলগ্ন হয়ে ও ছট্‌ফট্‌ করছিলো।

অবশেষে গুনীন বন্ধন আলগা করে দিলো। দিয়ে বললো—মা-র জন্য মন কেমন করছে বুঝি ?

—হুঁ।

—এই তো কটা দিন মাত্র। তারপরেই তো আবার যাবে মায়ের কাছে। অনেক যত্ন, অনেক আদর এ সংসারে কিন্তু তবুও যেন মনটা কেমন কেমন

করে যমুনার। আশে পাশে চারদিকে কোথাও একটা চেনা মানুষের মুখ নেই। কিন্তু তার জন্যও ততটা নয়। কেমন একটা ভয় ভয় অস্বস্তি ওর সমস্ত মন জুড়ে আলোড়ন তোলে। কিসের একটা প্রচ্ছন্ন অভাব যেন ওর মনে ঝড়ো-বাতাসের মত হা-হুতাশ করে। অনেক কথা মনে পড়ে যমুনার। মার কথা মনে পড়ে, স্বর্গত বাবার স্মৃতিও কিন্তু তার চেয়েও আর একজনের চিন্তা ওর মনে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে।

কে জানে কি হয়েছে। হয়তো এর মধ্যে সে ফিরে এসেছে গ্রামে। আবার ফিরে পেয়েছে আগেকার জীবন। সেই বুড়ো শিবতলার পাশ দিয়ে শব্দ করে সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে স্কুল থেকে ফিরছে। রোজ ফিরবে। কিন্তু সেখানে যমুনা নামে একটি মেয়েকে আর কোনদিনও দেখতে পাবে না, খুঁজে পাবে না সে। তার জন্য কি দুঃখ হবে তার? বেদনায় টন্‌টনিয়ে উঠবে বুকটা? হয়তো কিছুই হবে না। শুধু আগেকার দিনগুলোর মত তার জীবনের দিনগুলো উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলবে। একটুও মন্থর মনে হবে না কোন মুহূর্ত। একবার ভাববে না যমুনা নামে সেই মেয়েটি কোথায় গেলো, আর কেমন করেই বা পড়ে আছে সেখানে।

ক-টা দিন এই করেই কাটলো যমুনার। সেই খাওয়া-নাওয়া-চিন্তায় মশগুল হ'য়ে থাকা আর রাত্রির অবসরে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া।

এমনিতে গুর্নানকে মন্দ লাগে না যমুনার। কথা, ব্যবহার সবই ভাল। কিন্তু কেমন একটা বিভীষিকা যেন লুকিয়ে রয়েছে ওই লোকটার রক্ত-মাংসের অতলে। রাত হলেই মনে হয় সে কথাটা। গুর্নান যেন রাত্রির কালো অন্ধকারে একটা মূর্তিমান ত্রাস। তাই রাতটাকেই বড় ভয় করে যমুনা। ভয়ে ওর কুমারী-আত্মা হিম হয়ে আসতে চায়।

গুর্নান একদিন বললো। রাত্রির অন্ধকারে ঠিক তেমনি ঘন হয়ে যমুনাকে বন্দী করে বললো—তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী। তার মানে বিয়ে নামক একটা আনুষ্ঠানিক পর্বের মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পর এক হয়ে গেলাম। আপন হোলাম! এখন আমরা একাত্মা। আমি মানেই পুরোটা যেমন আমি নই, তুমি মানেও সবটা তুমি নও। উভয়ের মধ্যে আমরা উভয়ে রয়েছি। স্বামী-স্ত্রী মানেই তাই। তুমি যা চাইবে তা দিতে হবে আমাকে। দেখতে হবে, কি পেলে খুশি হও, সুখী হও তুমি। ঠিক তেমনি তোমাকেও দেখতে হবে আমি কি চাই, কি পেলে আনন্দ হয় আমার।

অত কথার সবটা যদিও কানে যায় নি, তবুও মোদ্দা কথাটা বুঝতে কষ্ট হয়নি যমুনার। মনের সমস্ত ভয়, সংশয় অথবা সঙ্কোচ, সে-সব মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য যমুনাই কি কম চেষ্টা করেছে নাকি? কিন্তু পারে নি। মুক্তি পায়নি যমুনা। কাঁটাভর্ত্তির মনোবেদনা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে ধরে দিতে হচ্ছে স্বামীর বাহু-বন্ধনে। কিন্তু সব মিলিয়ে ওর মনে একটা চাপা বিস্ময় ধুমায়িত হয়ে উঠেছে। বিবাহিত জীবনটাই একটা কঠিন অব্যক্ত বিস্ময় বলে মনে হয়েছে ওর।

ওই যে লোকটা, যমুনার স্বামী গুনীন, অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছে যমুনা, লোকটা কত অসহায়। অন্ততঃ তাই মনে হয়েছে ওর, বুঝতে পেরেছে। অথচ কি নেই গুনীনের? সব আছে। টাকা-পয়সা, জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ি সব আছে। আর আছে নিঝঞ্ঝাট সংসার। কিন্তু তবুও কোথায় যেন লোকটা বড় অসহায়। থেকে থেকে যমুনার মনে হয়, সব পুরুষই বুঝি মেয়েদের কাছে এমনি।

কদিনেরই বা পরিচয় গুনীনের সঙ্গে? কদিনই বা বিয়ের বন্ধনে বন্দী হয়েছে ওরা কিন্তু এর মধ্যেই এমন একটা আকর্ষণ কি করে অনুভব করতে পারছে গুনীন। কী করে অসহায়ের মত, কাঙালের মত অমন করে প্রার্থনা জানাতে পারে, ব্যথিত হ'তে পারে আসন্ন বিরহের কথা ভেবে। সেই কথাই বলছিলো গুনীন। যমুনাকে একটা তুলোর পুতুলের মত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল—কেমন করে তোমাকে ছেড়ে থাকবো যমুনা?

কই, এ কথা তো মনে হচ্ছে না যমুনার। মনে হচ্ছে না কোন সময়েই। গুনীনের কথামত ও যদি তার একটা অংশ হয়, তবে ওর মনেও তো ব্যথার ছোঁয়াচ লাগা উচিত ছিলো। কিন্তু সেরকম কিছুই তো ভাবতে পারছে না যমুনা। বরং মনে হচ্ছে মায়ের কাছে ফিরে গেলে কুমারী-জীবনের সেই মুক্তির স্বাদ ফিরে পাবে। তাই গুনীনের কথা শুনে যমুনা বললো—যেমন করে এতদিন ছিলে।

—ছিলাম তো নিশ্চয়ই, থাকতামও কিন্তু তুমিই থাকতে দিলে না।

—আমি! অবাক হলো যমুনা।

—হ্যাঁ, তুমি। তুমিই আমাকে নতুন জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছ।

নতুন জীবন! যমুনা মনেমনে অবাক হলো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক, সে তো সকলের জীবনেই আসে। এতে আবার নতুনত্বের ইঙ্গিত

কোথায়! সহসা কথাটার গূঢ়-অর্থ খুঁজে না পেয়েও বললো—কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি তোমাকে!

—না, বলতে হয় না। রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে কেমন যেন ভারি শোনালো গুনীনের কণ্ঠস্বর—এতদিন ধরে যে স্বপ্ন দেখছিলাম আমি! স্বপ্নে খুঁজছিলাম তোমাকে। অনেক স্বপ্ন ক্ষয়িত হয়ে বাস্তব হয়েছ তুমি।

কথাগুলো একটু যে বোঝে না যমুনা, তা নয়। তবুও এই সব কাব্যিক, ভাবুক কথাগুলো কেমন যেন দুর্বোধ্য বলে মনে হয় আজ। দুর্বোধ্য হলেও কেমন একটা সূক্ষ্ম আনন্দের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে দেহে মনে। কেমন একটা দুর্বোধ্য অনুরণন গুন্‌গুনিয়ে উঠতে চায় রক্তের অণুতে অণুতে। আশ্চর্য একটা নেশার মাদকতা শিহরণ হয়ে দোলা দেয় মনে। সে নেশা কথার। এমন কথা শুনতে ভালো লাগে। মনপ্রাণ ভরে ওঠে।

যমুনা বললো—আমি না থাকলে খুব কষ্ট হবে তোমার?

—হঁ্যা।

—কী কষ্ট?

—মনের।

—আর যদি বিয়ে না হতো তোমার সঙ্গে?

—হতো না, কষ্ট হতো না। তা হ'লে যেমন ঠিক তেমনিই থাকতে পারতাম। মনে করতাম অনেক স্বপ্নের বিন্দু দিয়ে যে বাস্তব, সে এখনও অনেকদূরে।

যখন ও শুতে এলো পায়ে পায়ে ঠিক তখনই ওর মনে আবার সেই বিভীষিকা দোলা দিয়ে উঠলো, ভাবলো—এবার ওকে রাত্রির কালো অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে হবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো যমুনা।

কিন্তু পেছনের জানালায় যে গুনীন চুপচাপ বসে আকাশের তারা গুণবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো সেটা লক্ষ্য করে নি যমুনা। যখন ঘুরে বিছানার দিকে তাকালো, দেখলো বিছানা শূন্য। কেউ নেই সেখানে। হঠাৎ চমকে উঠলো যমুনা। কেমন একটা দুর্বোধ্য ভীতির সঞ্চার সংক্রামিত হয়ে উঠতে চাইলো ওর মনে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতেই আশ্বস্ত হলো। দেখলো গুনীন চুপচাপ বসে রয়েছে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলো যমুনা। আকাশে আজ আলোর স্বচ্ছতা। জানালার ওপারে কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম ফুলে ফুলে আলোর কণা। কোথায় যেন

চাঁদ উঠেছে। আকাশের কোন প্রান্তে কে জানে। অজান্তেই পা পা করে এগিয়ে এলো, এসে দাঁড়ালো গুনীনের এক পাশে। দেখলো তন্ময় হয়ে লোকটা তাকিয়ে রয়েছে। ওর মনটা বুঝি বাস্তব পৃথিবীর বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বিচরণ করছে ওই শূন্যে, অসীম আকাশের নীলিমার রাজত্বে।

যমুনাও একদিন ভালোবাসতো, আজও ভালোবাসে তন্ময় হয়ে বসে ওই অসীম আকাশের মধ্যে বন্দী মনকে মুক্তি দিতে। ওর মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। ছোটবেলায় যমুনা অবাক হয়ে দেখতো। নভোমণ্ডলের ওই যাযাবর মেঘের সঙ্গে সঞ্চরণ করতো ওর কল্পনাপ্রবণ মন। অথচ কি-ই-বা বয়স হ'য়েছে আজ? মনে হয়, এখনই কেমন একটা স্থূল চিন্তাধারা ওর সেই স্বপ্নিল মনটাকে দিনে দিনে গ্রাস করে মেরে ফেলতে চাইছে।

খুব বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি যমুনা। পাশ থেকে একবার বুঝি দেখে-ছিলো গুনীনের মুখখানা। কেমন যেন অসহায়তা ওঁর সারা মুখে থইথই করছে। আর তাই দেখে কেমন একটা ভীরু মমতা দ্রুততালে বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠতে চাইছিলো যমুনার। ও যে কি করবে, কি করতে পারে অথবা কি করলে গুনীনের ম্লান মুখের আয়না থেকে অসহায়তার ওইটুকু মেঘ মুছে দিতে পারে, তাই ভেবে প্রায় অস্থির হয়ে উঠছিলো।

আচমকা, একেবারে আকস্মিকভাবে গুনীন এক হাতে যমুনার কোমর জড়িয়ে ধরলো। অথচ যমুনা ভাবতেও পারেনি ওর উপস্থিতি ঘুণাক্ষরেও গুনীন জানতে পেরেছে কিনা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যমুনাকে কাছে টানলো গুনীন। টেনে নিলো বুকের কাছে। তারপর পাঁজাকোল করে তুলে নিয়ে, আধশোয়া করে বসালো কোলের ওপোর। আস্তে করে মুখ নামিয়ে আনলো গুনীন। একেবারে যমুনার মুখের সঙ্গে লাগিয়েই ফেললো যেন। তারপর বললো—সত্যি, তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে ইচ্ছা করছে না আমার।

--তবে যেও না।

—যাবো না?

—না।

—ওদিকের কাজকর্ম কে দেখবে?

—দেখতে হবে না।

হাসলো গুনীন,বললো—তোমাদের মেয়েদের মত যদি হতে পারতাম তবে তো কথাই ছিলো না। যাওয়ার প্রশ্নই তুলতাম না।

—তবে তুলছো কেন?

—যেতে ইচ্ছা করছে না যে।

—বেশ তো, থাকো।

—না।

—অন্ততঃ আর দুটো দিন?

অথচ আজ এই সময়ে ভাবতে গেলেও অবাক লাগে, আশ্চর্য হয় যমুনা, কী করে ওকথাটা সে বলতে পেরেছিলো। কোন মনটা যে ওকথা বলেছিলো ভেবে পায় না। আজ সেই কথা ভাবতে বসে আপনা থেকেই কেমন একটা লজ্জা অব্যক্ত বিস্ময়ে ওর মনের মধ্যে দুলছে। ভেবে ভেবে কূল পায়নি যমুনা। যাঁর একটু স্পর্শে ও কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, পুরোপুরি মন থেকে গ্রহণের প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় এটা মাত্র প্রথম পর্ব। এখনও ওদের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচে এক হতে পারেনি, সেই লোকটাকে কেমন করে ও বলতে পারলো আরো দুটো দিন থাকতে! শুধু বলা নয়। এখন মনে হচ্ছে সেই বলার মধ্যে একটুও কি অনুনয়ের রঙ ছিলো না? ছিলো না মনের কোন আবেগ? নিশ্চয়ই ছিলো। তা নইলে কেমন করে সব দ্বিধা কাটিয়ে নিজের মনের অগোচরে ও কথাটা বলতে পেরেছিলো।

আবার মনে হলো, ঠিক সেই বিশেষ সময়টাতেই হয়তো কথাটা বলতে পেরেছিলো। আজ এই মুহূর্তে যদি সে-সব কথা হতো তা হলে কিছুতেই ওর মুখ থেকে ওই অনুনয়ের রঙ আবেগের সুরে ঝরে পড়তে পারতো না।

যমুনার মনে হলো কি যেন যাদুমন্ত্র লুকোনো রয়েছে বিয়ের ওই আনুষ্ঠানিক-পর্বের মধ্যে। আর রয়েছে একটা মোহ, তীব্র আবেগ পুরুষের সোহাগে। হয়তো সেই জন্যেই ওকথাটা তখন বলতে এত সহজ মনে হয়েছিলো তার কাছে। আসলে বোধ হয় বিয়ের পর পুনর্জন্ম হয় মেয়েদের। তারা পুরনো স্মৃতি যতো আকড়াতে চায়, তত বেশি ভুলতে থাকে। ভুলতে থাকে স্বামীর সোহাগ-আদরে, তার সান্নিধ্যের মোহন স্পর্শে।

সেই সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হলো যমুনার। আসলে জল আর মেয়েদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। একটা তরল পদার্থ আর একটা রক্ত-মাংসের স্থূল দেহমাত্র। জল যে পাত্রেই রাখা যাক সেই রঙ ধরবে, আর

মেয়েরা যেমন স্বামীর সান্নিধ্যে আসবে সে সেই পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাবে। যেতে হবে। অন্য রঙের প্রতিফলন হ'লেই সংসারে বেমানান তো বটেই, তা ছাড়াও সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনকালে মিলমিশ হয়ে শান্তি আসতে পারে না।

সশব্দে দরজা বন্ধ করবার পর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপালো যমুনা। যেন কয়েকটা মুহূর্ত আগে প্রলয়ঙ্করী একটা খণ্ডযুদ্ধ করে এসেছে ও। কেমন একটা শ্রান্তির ভারে ধুক্‌পুক্ করে কাঁপছে বুকটা।

সরাসরি বিছানায় না গিয়ে আজ একলাই এসে দাঁড়ালো সেই জানালার কাছে।

আজ আর চাঁদ দেখা গেলো না। দেখতে ইচ্ছাও হলো না যমুনার। জানালার শিক ধরে বাইরে তাকালো বটে কিন্তু আকাশে নয়। ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সেই কৃষ্ণচূড়ার ডালে। পড়লো ওপাশের কাঁঠালতলার পাশের পরিষ্কার জায়গায়। ওই যেখানে ডালিমগাছটা ফুলে পাতায় ভরে ক'দিনেই যেন ডাগর হয়ে উঠেছে, সেখানে। কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলা দিয়ে, ডালিমগাছের পাশ কাটিয়ে সরু পায়ে চলা পথটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। এই পথটা এগিয়ে গিয়ে তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটু এগুলে। আর সেই তেমাথার সংযোগস্থলে আশ্চর্য ছায়াছায়া শান্ত পরিবেশ। জায়গাটার আশে-পাশে অনেক গাছ-গাছালি। আম, কাঁঠাল আগাছা-কুগাছা অনেক।

জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তাটা দেখতে দেখতেই যমুনার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। অব্যক্ত বেদনার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সেইদিকে। এই পনেরোটা দিন ধরে থেকে থেকে, পলে পলে যার কথা ভাবতে গিয়ে ওর বুকটা টনটনিয়ে উঠেছে, সেই লোকটার কথাই মনে পড়লো। মনে পড়লো আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো এই গ্রাম, এই পাড়ার সব অস্তিত্ব যেন আলগোছে মুছে গেলো ওর চোখের দৃষ্টি থেকে। শুধুই শূন্য প্রান্তর।

ভাবতে বসে আবার সেই বেদনাটা খচখচিয়ে উঠলো যেন মনের মধ্যে। সেই সংশয়, সেই সন্দেহ আর সেই বিস্ময়। কেন চলে গেলো, কেন পালালো এই যে একটা প্রশ্ন, কিছুদিন থেকে ভেবে ভেবে তার সমাধান পায়নি যমুনা। সেই প্রশ্নটাই নতুন করে আবার ওর মনের মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠলো।

ক' দিন থেকেই আসা-যাওয়া বন্ধ ছিলো। কী অপরাধ যে করেছিলো যমুনা ও নিজেই আজ ভেবে পায় না। শেষ যেদিন এসেছিলো, অনুরোধ

করেছিলো যমুনাকে, সেদিন একটু অস্থির হয়েই পড়েছিলো যমুনা। আর সেই অস্থিরতার মধ্যে কী যে বলেছিলো আজও স্মরণ করতে পারছে না সে-কথা। কিন্তু ন্যায় অন্যায় যদি কিছু বলেই থাকে, তার পেছনে যে কি কার্যকারণ ছিলো তাকি একটিবারের জন্যেও ভেবে দেখেনি সে? বোঝেনি, সেই অবস্থায় মেয়েরা স্থির থাকতে পারে কিনা? তবে কি সেই অভিমানেই পালালো? কিন্তু তাও নয়। তার পরও তাকে দেখেছিলো যমুনা, কথাও বলেছিলো।

দু-তিন দিন আসে নি বিশু। তাই না যমুনা গিয়েছিলো। গিয়েছিলো সেই ডলপুতুলটা সঙ্গে করে। ওটার প্রতি যে বড় টান ছিলো তার। গিয়ে বুড়ো শিবতলায় সন্ধ্যাবেলায় অপেক্ষা করছিলো। এটাই বিশুর ফিরবার পথ। প্রথমে ও শব্দ শুনলো, তারপরই চলন্ত সাইকেলের পথ রোধ করে দাঁড়ালো যমুনা। দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো, যেন চমকে উঠলো বিশু।

বেশি কথা নয়, মাত্র দুটো চারটে। তারপরই ডলপুতুল বের করে সব স্মরণ করাতে চেয়েছিলো যমুনা। পুতুল দেখে চমকে উঠল বিশু। তারপর আর দাঁড়ায়নি। যেন এক ঝলক ঝড়ো হাওয়ার মত পালিয়ে গেল সে।

তার পরদিনই শোনা গেল সে নেই। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কোন অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে।

তবে কি সে মনে করেছিলো সবটাই একটা খেলা মাত্র? সাধারণ খেলা! বয়স যখন কম ছিলো তখন এসবকে খেলা বলতে কোন দ্বিধা থাকতো না কিন্তু তারপর?

যমুনার স্পষ্ট মনে পড়ছে সেদিনের কথা। ফক ছেড়ে ও যেদিন শাড়ি পরেছিলো। দেখে অবাক হয়েছিলো বিশু। ওই ডালিম-গাছটার তলায় অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলো যমুনার দিকে। তারপর এক সময় বললো—শাড়ি পরেছ যে?

—এমনি।

—যাঃ! এমনি বুঝি শাড়ি পরে মেয়েরা?

শুনে যমুনার চোখমুখ-কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিলো। ও আর তাকাতে পারেনি মুখতুলে। কেমন একটা সলজ্জ জড়তা ওকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছিলো।

শাড়ি কি যমুনাই পরতে চেয়েছিলো নাকি? সকালে উঠে কেমন যেন

গম্ভীর দেখালো মাকে। খানিকক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে। তারপর যমুনাকে বললেন—যাও মা, পাল্‌টে এসো তোমার ফ্রক-ইজের।

অবাক হয়ে যমুনা চলেই যাচ্ছিলো। মা পেছনে ডাকলেন, বললেন—হ্যাঁ শোন্। ফ্রক নয় শাড়ি। আজ থেকে শাড়ি পরবি তুই।

তারপর মা নিজেই তাঁর ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি বের করলেন, বললেন—চল, স্নান করে নে। স্নান করে শাড়ি পরবি।

তারপর স্নান, সূর্যপূজো সেরে পুকুর পারেই শাড়ি পরলো ও। ছোটবেলায় এক আধবার যে শাড়ি পরেনি এমন নয় কিন্তু এবার থেকে ভালো ভালো ফ্রকের মায়া ত্যাগ করে শাড়ি পরতে হবে। ফ্রকগুলোর জন্য মায়া লাগছিলো ওর, তেমনি একটা পুলকও মনের মধ্যে সবাক হয়ে উঠেছিলো।

অতবড় শাড়ি পরে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিলো। কিন্তু উপায় নেই। মা বললেন, ফ্রক পরবার বয়স নাকি ছাড়িয়ে এসেছে ও। ভাবতে গিয়ে একটু যে আনন্দ লাগছিলো না তা নয়, সত্যই তাহ'লে বড় হয়েছে ও; ছোট্টটি আর নেই!

কিন্তু বিশুর মুখের কথা শুনে কেমন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিলো যমুনা। এমন একটা ভাবও যে কোনোদিন মনের মধ্যে উদয় হতে পারে, সে-কথা আগে জানা ছিলো না। যেন আজ নতুন করে জন্ম হলো যমুনার। পুরোনো সব কিছুকেই ওই দামী দামী ফ্রকের মতই তাচ্ছিল্য সহকারে ফেলে দিয়েছে। মনটাও যেন পুরোনো পোষাক ছেড়ে নতুন পোষাকে সেজেছে। সব যেন আজ নতুন লাগছে। এমন কি বিশু পর্যন্ত।

অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে থেকে চেষ্টা করেও যখন যমুনা তাকাতে পারলো না বিশুর চোখে, মনে হয়েছিলো পালিয়ে যাবে ও। ছুটে পালিয়ে বাঁচবে বিশুর সমুখ থেকে। কিন্তু পারে নি। দুষ্টুটা বঝি বুঝতে পেরেছিলো যমুনার মনের কথা। খপ্ করে যমুনার হাতটা চেপে ধরে বিশু বললো—পালাচ্ছো যে?

থরথর করে কেঁপে উঠলো যমুনার সমস্ত দেহ। আশ্চর্য একটা শিহরণ ওর রক্তে বিজলী ঝলকের মত শক্ দিয়ে গেলো।

—মুখ তোলো। আর একহাতে যমুনার চিবুক তুলে বললো বিশ্বনাথ।

মুখ তুললো যমুনা। তুলে অবাক হলো আরও। আজকের খুশিটা শুধু ওর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বনাথের চোখেমুখেও তার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

বিশু সেই কথাটাই পুনরুক্তি করলো—শাড়ি পড়েছ যে ?

—এমনি, যমুনাও সেই একই উত্তর দিলো।

—ধ্যেৎ! ভেবেছ বুঝি আমি কিছুই বুঝি না? সব জানি আমি।

—কী জানো ?

—কেন শাড়ি পরেছ সেই কথা।

কৌতুকের চেয়েও কথাটা শুনে যমুনার সারা শরীর ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠলো। কট্‌মট্‌ করে তাকালো বিশ্বনাথের দিকে, বললো—ছিঃ!

—ইস্‌। হাত ধরে টানতে চেষ্টা করলো বিশ্বনাথ।

—বেশ। জানো তো জানোই। সহসা মুখটা ফিরিয়ে নিলো যমুনা। মনে হলো ও আহত হয়েছে।

সত্যিই ওর কান্না পাচ্ছিলো। বুক ঠেলে একটা কান্নার গমক কণ্ঠনালী পেরিয়ে উঠে আসতে চাইছিলো দ্রুততালে। ওর প্রথম যৌবনকে এমন করে আহত করবার কী অধিকার আছে বিশ্বনাথের? কেমন একটা চাপা উত্তেজনায় বুকটা স্পন্দিত হচ্ছিলো যমুনার। এই কিছুক্ষণ আগেও যে লজ্জার একটা রমণীয় আবেশে ভেজা পাখির মত ধুক্‌পুক্‌ করে কাঁপছিলো, এই মুহূর্তে সেই আবেশ কোথায় উধাও হয়ে গেলো! দাঁড়াতে পারলো না যমুনা। এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো।

এই জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের অবাধ মুক্তিতে চোখমেলে দিয়ে সেই একটা প্রশ্নেই বিভোর হয়ে রয়েছে যমুনা। যখন ও বড় হলো, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পড়লো, দিন এগুলো এক এক করে। তারপরও কি যত কথা, যত গল্প সব খেলা খেলা অভিনয়! তাই যদি হবে তাহ'লে কেন সব রঙ্গিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতো ও, কেনই বা সে সব বলতে কোনোদিন এতটুকু বাঁধেনি বিশ্বনাথের? কেন সেসব বলতো, যা বাস্তবে কোনদিন রূপায়িত হবে না?

দাসবাড়ির আশাদির যখন বিয়ে হলো, যমুনা গিয়েছিলো দেখতে। সন্ধ্যায় লগ্ন। কতক্ষণই বা লাগবে বিয়ে শেষ হতে? কিন্তু ফিরবার পথে বুঝতে পারে নি, ওর জন্য এমন করে পথে দাঁড়িয়ে থাকবে বিশ্বনাথ।

কৃষ্ণপক্ষ না হ'লেও অন্ধকার যে একটু ছিলো না, তা নয়। ম্লান জ্যোৎস্না ছিলো। কিন্তু ওই বুড়ো শিবতলাটা সত্যি অন্ধকার। অনেকগুলো পত্রবহুল গাছের ঘন-সন্নিবেশ ওখানে। যমুনা চম্‌কেই উঠেছিলো যখন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বিশ্বনাথ।

—তুমি! যমুনা বিস্মিত হলো।

কিন্তু কথা বলেনি, উত্তর দেয়নি বিশ্বনাথ। একটু থতমত খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

একটু কাছেই সরে এলো যমুনা, বললো—কি করছো এখানে?

এতক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়েছিলো বিশ্বনাথ। এবারে সে কথা কইলো—এমনি।

—না। শক্ত শোনালো যমুনার কণ্ঠ। কেন এসেছ বলো?

—তোমার জন্যে।

—কেন?

কেন, এ প্রশ্নের জবাব চট করে দিতে পারে নি বিশ্বনাথ।

কেমন যেন হাসি পেলো যমুনার বিশ্বনাথকে অমন বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। এ ঘটনা আজ নতুন নয়। বড় জমিদারগিন্নী কখনও গাল-মন্দ করলে এমনি করে মিইয়ে যায় বিশ্বনাথ। তাই ভেবে হাসি পেলো যমুনার। কিন্তু বিশ্বনাথের এই ম্লান মুখ দেখে ও মনেমনে একটু যে বেদনা বোধ না করছিলো, তা নয়। তাই আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো বিশ্বনাথের মুখের দিকে। তারপর বললো—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—কোথাও না।

—বাড়ি যাওনি? এগিয়ে এলো যমুনা।

কথা বললো না বিশ্বনাথ।

আরও একটু এগিয়ে এসে যমুনা বিশ্বনাথের হাত ধরতে গিয়েছিলো। কিন্তু নিমেষের মধ্যে কি যেন হ'য়ে গেলো। ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বনাথ ওকে বুকের কাছে টেনে নিলো।

হঠাৎ একটা শব্দে পেছন ফিরে তাকাল যমুনা। দেখলো গুনীন উঠে বসেছে বিছানায়।

যমুনা নড়লো না, সরে দাঁড়ালো না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো জানালার শিক ধরে। ওর মনটা কেমন একটা দুর্বোধ্য কুয়াশা-কুণ্ডলীর মধ্যে হারিয়ে গেছে যেন। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই মনটাকেই স্মৃতির মধ্যে ফিরে পাবার জন্য আকুপাকু করতে লাগলো।

আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে এলো গুনীন। এসে যমুনার পাশে দাঁড়িয়ে, ওর ডান হাতখানা রাখলো যমুনার কাঁধের ওপর, বললো—মন কেমন করছে বুঝি?

চমকে উঠলো যমুনা। না, স্বামীর স্পর্শের জন্য নয়। কি যেন একটা কথা জানতে চাইছে গুনীন। কি কথা! কার কথা! সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেলো যমুনার।

—মন কেমন করছে? আবার বললো গুনীন।

—মানে।

—আমি জানি তুমি লুকোতে চাইছ।

আৎকে উঠলো যমুনা। কী বলতে চায় লোকটা!

—বাইরে একটু শক্ত দেখালে কি হবে, আমি ঠিক চিনেছি তোমাকে।

এবার যেন সমস্ত আকাশটাই ভেঙে পড়লো যমুনার মাথার ওপোর। কী করে বুঝলো, জানতে পারলো লোকটা! সব বলে দিয়ে কে যমুনার সমস্ত ভবিষ্যতের পথে এমন করে কাঁটা ছড়ালো। স্মৃতি স্মৃতিই। বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই, আজ একথা স্বামীকে কি করে বোঝাবে যমুনা?

গুনীন বললো— কাল সকালেই তো চলে যাবো, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবছো বুঝি?

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো যমুনা। না, ও যা মনে করছিলো তার ধার কাছ দিয়েও যায় নি গুনীন। যেমন স্বস্তি পেলো যমুনা, তেমনি একটা সমস্যাও দেখা দিলো। বিরাট সমস্যা। এই যে স্বামী তাকে প্রশ্ন করছে, এর মধ্যে অনেক অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। অথচ প্রত্যেক পুরুষমানুষই বোধ হয় এ প্রশ্নের একটা নির্দিষ্ট উত্তর আশা করে। আর সে উত্তরটা পেলে ওরা তৃপ্ত হয়, আনন্দিত হয়। সেটা যেমন একটি কথার উত্তর, ঠিক তেমনি আর একটি কথার উত্তরে যে কোনো পুরুষের মনেই বোধ হয় ঝড় তোলা সম্ভব। এবং সেটা অতি সহজেই করা যায়। এক্ষুনি যদি যমুনা 'না' বলে, গুনীনের মনে কি একটুও আঘাত না লেগে পারে?

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ পর ভেবেচিন্তে একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বললো যমুনা।

একটা মাত্র মিথ্যা কথার বিনিময়ে যদি একজন পুরুষ মানুষকে চিরকালের মত বেঁধে রাখা যায়, তেমন মিথ্যা বলতে কোন অপরাধই নেই। নেই কোন পাপ। তাই অতি সহজেই সে কথাটা বলতে পারলো যমুনা।

শুধু বললোই না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, ওর স্বামীর সমস্ত মুখে একটা

আনন্দের জ্যোতি যেন ঝিল্‌মিলিয়ে উঠলো। একেবারে আহ্লাদে বুঝি গদগদ হয়ে পড়লো লোকটা।

তারপর ওরা এসে বসলো বিছানায়। গুনীন বললো—তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইবে।

যমুনা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

—হ্যাঁ, তোমার মাকে বলবে একটা কিছু। বলবে এখানে তোমার ভাল লাগে না।

—বলবো, ছোট্ট করে জবাব দিল যমুনা।

কিন্তু শুয়ে কেন যেন হাসি পেলো যমুনার। এই যে কিছুক্ষণ আগে ও ভেবেছিলো– পুরুষ মানুষের সবটাই বুঝি এই রকম, তাই সত্য হলো। নিজে চোখেই দেখলো যমুনা। হাসি পেলো এই ভেবে যে, পুরুষ মানুষগুলো এক একটা মেয়ের কাছে কত বেশি অসহায়। ওর স্বামী হয়তো ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করতে পারে না, বুঝতে পারেনি যে, এই মুহূর্তে যমুনার মনজুড়ে আর একটা লোকের স্মৃতি আলোড়ন তুলে বেড়াচ্ছে। শত্রু শত্রু বলে এই পনেরোটা দিনে যার মা নিজের ছেলেকে শাপ-শাপান্ত করছে, সেই শত্রুর কথাই এখন ভাবছে যমুনা।

চার

কয়েকটা মাস ধরে কি অস্বস্তিতেই না সময় কেটেছে নীরজাসুন্দরীর। কত রকমের অকথা, কুকথাই না ভেবেছেন। কিন্তু মনেরই বা দোষটা কিসের? একটা দুটো দিন তো আর নয়, পুরো চার-চারটা মাস। এই এতগুলো দিন তিনি কি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পেরেছেন, না সুস্থির হয়ে দু' গ্রাস ভাত মুখে তুলতে পেরেছেন নিশ্চিন্তে। রাতে ঘুম নেই চোখে, মনে সোয়াস্তি নেই দিনে। শুধুই ভেবেছেন কী হলো, কী হলো! ওইযে মেযেটা মাকে ফেলে চলে গেছে, সে বুড়ি মরলো না বাঁচলো তার একটা খবর পর্যন্ত নেবার সময হলো না মেযের? সন্তান না শত্রু। সেই যে সাধু সন্ন্যাসীরা বলেছেন—"কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রাঃ" সেই কথাটাই হলো মোক্ষম। তা নইলে পেটের সন্তান, সে কিনা ভুলে থাকতে পারে বুড়িমাকে এতদিন?

হাঁকডাকে বাড়ি কাঁপাচ্ছেন নীরজাসুন্দরী। ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন যেন—বলি কই গো, অ কেষ্টর মা। শুনছিস নাকি? না কানের মাথা চিবিয়ে বসে আছিস? ডেকেডুকে যে পাব, তার জো-টি পযন্ত নেই।

কেষ্টর মা এতক্ষণ কোন্ কাজে ব্যস্ত ছিলো কে জানে। হাঁকডাক শুনে এবার সে সামনে এসে বললো—একেবারে বাড়িটাই যে মাথায় তুলেছ দেখছি। বলি ব্যাপারটা কি হলো? নিশ্চিন্তে যে কাজকর্ম করবো তাও করতে দেবে না। বলি অত হাঁকডাকটা কিসের গো মা?

এ বড় শক্ত ঠাঁই জানেন নীরজাসুন্দরী। কেষ্টর মার মুখে আটকায় না কিছু। তাই মেয়েছেলেটাকে বড একটা চটান না তিনি। কে জানে, কি বলে বসবে। তাই স্বরটা একটু নরম করে বললেন- বাড়িতে তো আরো লোক আছে, না তুই একাই? সে গেলো কোথায়। মনোরমা?

—কে জানে বাপু, অতশত জানি না আমি। তোমার জা' তুমিই জানো।

—দেখ্ কেষ্টর মা, কথা বললেই এমন গোখরোর মত ফোঁস করিস না। একটু যেন কড়া-ই শোনালো নীরজাসুন্দরীর কণ্ঠস্বর, আমাকে কথাটা আগে বলতে দিবি তো? না, নিজের মনে

ততক্ষণে কেষ্টর মা চুপ করে দাঁড়িয়ে গেছে। এমনিতে নীরজাসুন্দরী বড় একটা চটেন না কিন্তু একবার রেগে গেলে সৃষ্টি রসাতল। তাই নরম সুরে কেষ্টর মা বললো—আমি না হয় বক্‌বক্ ফোঁস ফোঁসই করি মা কিন্তু তুমি যে একেবারে বাড়ি মাথায় তুলেছ, ব্যাপারটা কী?

—মাথায় করবো না তো করবো কী' এঁ্যা! আচ্ছা তুই-ই বল, এই যে মেয়ের চিঠিটা এসেছে এতদিন পর, তা ডেকেডুকে জন-মনিষ্যি পাই না! বলি দুঃখটা কার না হয় তুই-ই বল না?

এতক্ষণ গোঁজগোঁজ একটা ভাব ছিলো কেষ্টর মার মনে, এই মুহূর্তে তা উড়ে গিয়ে দেখা দিল খুশির ছটা। তা যমুনাকেই কি কম করেছে নাকি? অসুখে-বিসুখে, বিপদে আপদে ওই মেয়েটাকে কতই না করেছে কেষ্টর মা। নিজের সন্তান নেই, যমুনার মধ্যে সেই অভাব পূরণের ইঙ্গিত কল্পনা করে কত রাত বিরাত জেগেছে। সেই মেয়েটার জন্য কি একটুও চিন্তা নেই কেষ্টর মার? আছে। কিন্তু কি করে যে সে-সব প্রকাশ করতে হয়, কেষ্টর মা জানে না। শুধু ওর মুখের দোষটাই লোকে দেখে কিন্তু ওর মনেও যে একটা মায়ের প্রাণ হাকপাক্ করে—সে কথাটা পৃথিবীতে কেউ বুঝলো না। কেষ্টর মা বললো—তাই বলো। মেয়ের চিঠি এসেছে না, চাঁদ হাতে পেযেছ তুমি। তা লিখেছে কি মেয়ে? ভাল আছে তো?

স্নিগ্ধ একটু হাসলেন নীরজাসুন্দরী, বললেন—খবর যদি ভালোই না হবে তো, তোদের ডেকেডুকে গলা ফাটাচ্ছি সাধে?

ততক্ষণে মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। ধোয়ামোছা কোন্ একটা কাজে ব্যস্ত ছিলো সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত মুছতে লাগলো আঁচলে, বললো—কি হলো তোমার দিদি?

সে দিকে তাকিয়ে নীরজাসুন্দরী বললেন—এতক্ষণে এলি? আমি তো ডেকেডুকে সাতরাজ্যি খুঁজে মরছি। স্নিগ্ধ হাসিতে ঝক্‌ঝক্ করছে নীরজা-সুন্দরীর মুখ।

মনোরমা বললো—চুলোটায় কদিন ধরে গোবর জল পড়েনি তাই।

কয়েকটা মুহূর্ত আগেও নীরজাসুন্দরী মনেমনে যে চটেছিলেন না, তা নয় কিন্তু এই মুহূর্তে তা ধরতে পারবে কে? নিজে নিজেই সে সব ভুলে বসে আছেন।

মনোরমা বললো—তা, যমুনার চিঠি এলো বুঝি।

—হ্যাঁ লো।

—এতদিনে বুঝি মায়ের কথা মনে পড়েছে মেয়ের?

—তাই তো বলছিলাম মনো। আমি তো আকাশ-পাতাল ভেবেই মরি। সেই যে গিয়ে ছ' সাত খান চিঠি বুঝি দিয়েছিলো সাকুল্যে। তাও ন-মাসে ছ-মাসে। কিন্তু তাই বলে এত দেরি তো কোনবারই হয়নি! চার চারটা মাস। বাবা বাবা, আমি তো শাপমুন্নিই করতে বসেছিলাম আর কি! কিন্তু মেয়েরও বিপদ আপদ হতে পারে, আর তার জন্যে চিঠিপত্র বন্ধ থাকতে পারে, সে কথাটা পোড়া মন একবারও বোঝে না ছাই।

—বিপদটা আবার কিগো দিদি?

এবার যেন আরও একটু স্নিগ্ধ হাসির ছটা ঢেউ খেলে গেলো নীরজা-সুন্দরীর মুখে। তিনি বললেন—বালাই, ষাট। বিপদ হবে কেন রে? তাঁর ইচ্ছায় মেয়ে-জামাই আমার ভালোই আছে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজের মনে নিজেই হেসে উঠলেন, বললেন—ও মনো, মেয়ে যে পোয়াতি লো। ছেলেপুলে হবে।

—তাই বলো, এক ঝলক খুশি কেষ্টর মার মুখেও দেখা গেলো, তাই বলি, সাধে কি আর তুমি হাঁকেডাকে বাড়ি মাথায় তুলেছ গা।

একরকম লজ্জাই পেলেন নীরজাসুন্দরী নিজের মনে। খুশির মাত্রাটা যেন একটু বেশিই হয়ে গেছে। সে কথা কি মনে ছিলো নাকি ছাই। আর যদি হয়েই থাকে, তাতেই বা দোষটা কিসের? একটামাত্র সন্তান যমুনা। সেই যমুনার গর্ভে সন্তান এসেছে। নাতি কি'বা নাতনীর মুখ দেখবেন এবার নীরজাসুন্দরী, তা মাত্রা একটু বেশি হলে ক্ষতিটাইবা কিসের? একটু না হয় উচ্ছ্বসিত হয়েই উঠেছিলেন তিনি। দিনরাত তো বলতে গেলে মুখ বুঁজেই থাকেন। এই যে চার চারটা মাস ধরে মেয়ের কোন খবর পান নি তার জন্য চিন্তা যা করবার তিনিই করেছেন। আর ক-টা লোক আছে সংসারে যে, যমুনার জন্য যার ঘুম বন্ধ হবে, বন্ধ হবে নাওয়া-খাওয়া। মা-ই বলো আর আত্মীয়-স্বজনই বলো, সবই এই নীরজাসুন্দরী। সে দিনের সেই যমুনা, ছোট্ট যমুনা আজ মা হতে বসেছে, একি কম আনন্দের কথা নাকি তাঁর কাছে? তাই বুঝি বেহুঁসের মত হাঁকডাকের একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তা শোনো একবার মুখপুড়ি কেষ্টর মার কথাটা? ঝপ্ করে কি কথাটা না বলে বসলো। মুখপুড়ির কথায় যদি কোন ছাঁদছিরি থাকে।

মুখের ধারেই মরলো পোড়াকপালী। তা হাঁকডাকটাই বা এমন বেশি করলেন কোথায়? চার মাস পর মেয়ের খবর দিয়েছে জামাই, সেই কথাটা শোনাবার জন্যই মনটা নিস্‌পিস্ করছিলো। সংসারে পদেপদে কতই না বিপদ, কতই না দোষ। না জানালেও ওই মুখপুড়িই বলতো—এমন খবরটা পেটে পেটে রেখেছ গো? কেষ্টর মাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা।

—তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি কেষ্টর মা। হাঁকডাক আর কি করলাম? মেয়ের খবর এসেছে তাই বললাম, তাতে আমার আদিখ্যেতাটা দেখলি কোথায়?

—আদিখ্যেতার কথা আমি কি বলেছি কিছু? তা মা তোমার তো একটা মাত্তর মেয়ে, তাকে নিয়ে যদি আদিখ্যেতা না করো তো, করবে কাকে নিয়ে?

—তাই বল্। নীরজাসুন্দরী নিশ্চিন্ত হলেন এতক্ষণে। কেষ্টর মার কথার ছাঁদছিরি না থাক, ওর মনটা আসলে পরিষ্কার। তা আর পরিষ্কার হবে না? কথায় বলে পুড়ে পুড়ে সোনা খাঁটি হয়। আর তাই হযেছে ওর। এই বয়সে কম দুঃখের আগুন কি গেছে নাকি ওর ওপর দিয়ে? সোয়ামী গেল, একটা মাত্র ছেলে তাও ভগবানের দরবারে বিসর্জন দিয়ে এখন পরের বাড়ি কাজ করে খেতে হ'চ্ছে। সবই অদৃষ্ট মানুষের।

মনোরমা বললো—তা কমাস হলো?

—এই সাতমাসে পড়লো। তাই তো লিখেছে জামাই। মেয়ের নাকি শরীল-গতিক ভালো নেই।

—তাকি থাকে নাকি? কেষ্টর মা বললো, কি বলে, এই তো পেথ্থম পোয়াতি। তা মা লিখে দাও। মেয়ে দিয়ে যাক জামাই।

—আমিও তাই ভাবছি। ঘরে বাইরে ওই তো একটা মাত্তর পুরুষ মানুষ। সেও কাজকম্মে ব্যস্ত। দেখবে কে? তাই লিখে দি, কি বলিস কেষ্টর মা?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, লিখে দাও। সায় জানালো কেষ্টর মা।

চিঠিটা আর একবার পড়লেন নীরজাসুন্দরী। লেখাপড়া তেমন শিখতে পারেননি। আকার-ইকার আর কোন রকমে অক্ষর পরিচয়। এইটুকু তাঁর বিদ্যা। তাও এক সময় বিয়ের জন্যই শিখতে হয়েছিলো। তা নইলে গ্রাম-পল্লীতে ক-জনই বা শেখে। মা বলতেন—"শিখ নীরু। নিজের

সংসার হলে দু' পাতা চিঠিপত্রও লিখতে হয়। সংসারের হিসাব-পাতি না রাখলে সে সংসারে কি লক্ষ্মী থাকেন নাকি?" তাই অনেক কষ্টে ওইটুকু শিখেছেন। পাত্রপক্ষরা মেয়ে দেখতে আসবে—তার নাম লেখ, ঠিকানা লেখ। সেই গরজেই লিখতে শিখেছিলেন। শিখেছিলেন বলেই না বিদেশে কর্তার কাছে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিতে পারতেন।

চিঠি পড়তে বসে কর্তার কথা মনে পড়ে গেলো নীরজাসুন্দরীর। আজ বেঁচে থাকলে কত খুশিই না হতেন। নিজেই হয়তো চলে যেতেন মেয়ে আনতে। নাতি হবে, এই যে নীরজাসুন্দরীর মনে কত আনন্দ, তিনি বেঁচে থাকলে আরও বেশি আনন্দ হতো। যেমন দিলখোলা লোক ছিলেন, তেমনি ছিলো খরচের হাত। বেঁচে থাকলে আজ কি যে করতেন সেই কথাই ভাবছেন নীরজাসুন্দরী।

চিঠি পড়তে পড়তে এই দুঃখের মধ্যেও যে একটু হাসি না পাচ্ছে, তা নয়। তাঁর যমুনা কত লজ্জাই না পেয়েছে! লজ্জা না পেলে সে কি দুটো কথা লিখে দিতে পারতোনা এই সঙ্গে। সে কথা ভেবেই আশ্চর্য পুলকে হাসি আসতে চাইছে।

নীরজাসুন্দরী বললেন—শুনলি? অ মনোরমা! সেই যে মেয়ে গুনীনের ঘরে শোবে না, ভাব তো এখন একবার।

হাসলো মনোরমা, বললো—যাবে না আবার। কত মেয়ে দেখলাম দিদি, সোয়ামী বলতে অজ্ঞান। একদিন কাছে না শুলে চোখে ঘুম আসে না।

পুলকে একটা ঠ্যালাই দিলেন নীরজাসুন্দরী। মনোরমাকে একটা ঠ্যালা দিয়ে হেসে যেন গড়িয়ে পড়তে চাইলেন, বললেন –কি যে বলিস ছাই! তোর মুখেরও ট্যাক্স নেই লো।

কেষ্টর মা বললো—কথা কি আর সাধে মুখে আসে গো মা, তোমার মেয়েই কি কম নাকি? ওদিকে সোয়ামীর জন্যে পরাণ পুড়ে। তা, মা রয়েছ সামনে, সোয়ামীর কাছে শুতে যেতে লজ্জা করে মেয়ের। লোক দেখানো বাহানা কি আর সাধে করেছে নাকি?

—তা আর আমি বুঝিনি? নীরজাসুন্দরী বললেন। তা বুঝলি লো, মেয়ের আমার গুনীনের দিকে বড়ই টান। সেই যে গিয়ে চিঠি দিয়েছিলো মেয়ে, লিখেছিলো—"ওনার শরীর কিছুদিন হইতে বড়ই খারাপ যাইতেছে।

ব্যবসাতে খাটা-খাটুনী বেশি" এই সব। তাই বলি টানটা কি আর কম? কিন্তু মেয়ে আমার লজ্জায় লাজুকলতাটি যেন। আর বয়সই বা এমন কী?

বিকেল গড়িয়ে এল প্রায়। দুপুরেই জামাইকে একটা চিঠি লিখবেন ভেবেছিলেন নীরজাসুন্দরী কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। সাত-পাঁচ অনেক কথা ভাবতে ভাবতেই বিকেল গড়িয়ে এলো। হয়তো লিখতেন কিন্তু দুপুরে একটু বিশ্রাম নেবেন ঠিক করে বিছানায় গড়িয়ে নিলেন। গড়াতে গিয়ে রাজ্যের কথা মনে হলো তাঁর। ভাবলেন, নিজের মনে সব কি গুছিয়ে লিখতে পারবেন তিনি? শেষকালে কিসের মধ্যে কি লিখবেন, মনোমত হবে না যমুনার। তা লেখাবেনই বা কাকে দিয়ে? সে শত্রুটাও যদি থাকতো আজ, গুছিয়ে গাছিয়ে লিখে দিতে পারতো। বলে দিয়েই খালাস হতে পারতেন নীরজাসুন্দরী। আজ আর তার কোন উপায় নেই। সেই যে পালিয়ে গেল শত্রু, বছর ঘুরে এলো তার টিকিটির পর্যন্ত পাত্তা নেই। শত্রু না হলে কি এমন করে ভুলে থাকতে পারে মানুষ? না হয় পেটেই ধরেন নি কিন্তু তাই বলে মায়ার কাজ কি একবিন্দুও করেন নি! মায়া মমতা বলেও একটা কথা থাকে, তারও বালাই নেই ছেলেটার। আপন মনে আপনিই বললেন নীরজাসুন্দরী—আমি না হয় পরই হয়ে গেলাম তোর বিচারে কিন্তু ওই যে যমুনা, একবেলা যাকে না দেখতে পেলে ছুটে আসতি। তারও কি একটা খোঁজ খবর নিতে নেই নাকি? তোর পেটে যদি এতই ছিলো, কেন তবে মায়া বাড়িয়েছিলি বেইমান!

আবার ভাবলেন ভালোই হয়েছে। সে-টা থাকলে কি সুখ-শান্তি থাকতো নাকি মেয়ের মনে? না সোয়ামী-অন্ত-প্রাণ হয়ে শান্তিতে সংসার করতে পারতো মেয়েটা!

অনেক ভেবে, চিন্তা করে পরের দিন নিজেই চিঠি লিখলেন নীরজাসুন্দরী। লিখলেন—ছেলে বলো আর সন্তান বলো, তুমিই। সংসারে আমার আপনজন কেউ নেই। যমুনাকে তুমিই এখানে পৌঁছে দিও বাবা।

চিঠিটা লিখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার পড়লেন। ডেকে শোনালেন মনোরমাকে, কেষ্টর-মাকে। তারপর ডাকে পাঠিয়ে দিলেন।

চিঠি ডাকে দিয়ে দিন গুনতে লাগলেন নীরজাসুন্দরী। মনে মনেই হিসাব করলেন পথে কদিন লাগবে, কবে গিয়ে পৌঁছবে চিঠিটা আর কবে গুনীন

যমুনাকে নিয়ে রওনা হ'লে কোন তারিখে এখানে এসে পৌছবে। দিন গুনতে গুনতেও ছ-সাতটা দিন পার হয়ে গেলো।

ঈশান চন্দ এসেছিলো এর মধ্যে। কাজের মানুষ, মোটে ছুটিছাটা নেই। মহাজনের গদিতে সর্বদাই কাজের চাপ। যমুনাকে আসন্ন প্রসবা জেনে ঈশান বললো—নাও বৌঠান, নাতির মুখ দেখবে এবার। তা তীর্থ-ধর্মের সময়ও এসে গেলো তোমার।

—সে সৌভাগ্য কি করে এসেছি ঠাকুরপো?

—তুমি দেখেছি হাসালে বৌঠান। তীর্থ-ধর্মের আবার ভাগ্য কী? মন চায়, চলে যাও। ঘুরে দেখে আস কাশী, বৃন্দাবন, গয়া, ভুবনেশ্বর - যেখানে খুশি। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে কি জানো বৌঠান? বলে "পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ"।

—আমিও তাই ভাবি অনেক সময়, বললেন নীরজাসুন্দরী, কিন্তু বাড়িঘর জায়গা-জমির একটা বন্দোবস্ত না করে কোথাও কি পা বাড়াবার জো আছে আমার? জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—কর্তা যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে গেছেন আমাকে।

—বেঁধে রেখে গেছেন, মুক্ত কর। ঈশান বললো—মন আপনা থেকেই চাইবে। কাকে বলে দেবতার টান, আসলে সবই ওই টানের ব্যাপার। যখন তিনি চাইবেন তোমাকে, সংসারের টানে কি আর আটকে থাকতে পারবে? আর জমি জায়গার জন্য চিন্তা কি তোমার? দেখাশুনা করার কি আর অসুবিধা হবে?

ঈশান চন্দ লোকটা ভক্ত শ্রেণীর। সাধু সাধু। ধর্মে-কর্মে বড় টান। নীরজাসুন্দরী ভেবেছিলেন মনোরমাকে এবার নিয়ে যাবে ঈশান কিন্তু যমুনার খবর শুনে ঈশান নিজে থেকেই বললো -নিয়ে যেতেই এসেছিলাম তোমার জা-কে কিন্তু মেয়ে আসছে, পোয়াতি মানুষ। দেখভাল করারও একটা লোক চাই। বিধবা মানুষ তুমি, তোমার কি এখন বৌঠান ও সব ঘাটাঘাটি চলে? আমার একটু কষ্ট হয় হোক, তাই বলে মেয়েটাকে নিয়ে বিপদে পড়বে তুমি আর আমি থাকতে সে সময় একটু দেখবো না? মনোরমা থাক। দেখাশুনা করবে, জলভাত দেবে।

জলভাত দেবার জন্যও মানুষের প্রয়োজন। বিধবা মানুষ নীরজাসুন্দরী, মেয়ের দরকার অ-দরকার সবকিছু দেখে উঠতে পারবেন কেন? এ সময়টা

মেয়ের যত্নআত্তি করতে হবে। প্রথম পোয়াতি মেয়ে। কিসে কি হয় বলা যায় না। তারপর ভগবানের দয়ায় যখন আতুড়ঘরে ' যাবে, নীরজাসুন্দরীর পক্ষে তো আর ছোঁয়াছুঁয়ি করা সম্ভব হবে না। তাই মনোরমা থাকলে সে ভাবনাটা তাঁকে আর ভাবতে হবে না। সেই কথাই বললেন নীরজাসুন্দরী, বললেন—আত্মীয় স্বজন তো মানুষের ওই কারণেই থাকে। তা পোড়াকপাল আমার, আমি আর তোমাদের জন্য কিছু করতে পারলাম না ঠাকুরপো।

—তার জন্য দুঃখ করোনা বৌঠান। তুমি বিধবা মানুষ, কি আর করবে? থাকতেন দাদা বেঁচে, তা হ'লে কি এই কথাটাই তুমি বলতে পারতে নাকি?

কথাটা ঈশান চন্দ্র ঠিকই বলেছে। কর্তা বেঁচে থাকলে আত্মীয় স্বজনকে ফেলে তিনিই কি কোন একটা শুভকর্ম করতেন নাকি? আজও মনে আছে নীরজাসুন্দরীর—যমুনার যখন মুখে ভাত দিলেন কর্তা, কত ঘটা! কত রাজ্যের আত্মীয়-স্বজন! কদিন ধরেই এ বাড়িতে নিমন্ত্রণ লেগে রইলো। হিসাবের দিকেতো জীবনে তাকালেন না? শুধু খরচ করেই গেলেন। তা নইলে মেয়ের মুখেভাতে আবার অমন হৈ-চৈ করে কে?

ঈশান গেলো তিনদিনের মাথায়। তার দিন পাঁচেক পরেই যমুনাকে নিয়ে এলো জামাই। খবর পেয়ে রূপনগরের ঘাটের দিকে ছুটলেন নীরজাসুন্দরী। ঘাট এমন কিছু বেশি দূরে নয় কিন্তু এগুতেই দেখলেন, ওরা নৌকো থেকে নেমে আসছে। জামাইকে দেখে আঁচল মাথায় তুললেন নীরজাসুন্দরী। গিয়ে ধরলেন যমুনাকে। ওরা দুজনেই প্রণাম করলো।

নীরজাসুন্দরী বললেন—রাস্তায় কষ্ট হয় নি তো বাবা?

—না, কষ্ট আর কি? বিনয় করে উত্তর দিলো গুনীন।

যমুনার দিকে এতক্ষণে চোখ পড়লো নীরজাসুন্দরীর। কী চেহারা হয়েছে মেয়ের! রক্তহীন পাংশুতায় ম্লান হয়ে গিয়েছে যমুনা। সমস্ত শরীরে ক্যাট্‌কেটে হলুদে একটা ভাব। ঘরে বসিয়ে মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নীরজাসুন্দরী বললেন—একি ছিরি হয়েছে তোর?

—কেন, কী হলো? ম্লান হেসে যমুনা বললো।

মনোরমা আর কেষ্টর-মা দাঁড়িয়েছিলো পাশে। তাদের দিকে তাকিয়ে নীরজাসুন্দরী বললেন—শোন্ মেয়ের কথা? তারপর যমুনাকে বললেন—

আয়নায় বুঝি একটিবারও নিজেকে দেখিস নি? তা নইলে শুকিয়ে এমন আমশী.হয়ে যেতে পারিস?

—আমশী আবার হলাম কোথায়? এতদিন পরে দেখলে কিনা, তাই।

— আমার না হয় চোখে ছানিই পড়েছে, বলি এই যে দুটো মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা তো আর চক্ষের মাথা খেয়ে বসে নি? কই, ওরাই বলুক দেখি একবার। কিলো কেষ্টর মা, বল দেখি তোরাই?

—তা পেথ্থম পোয়াতি কিনা, অমন তো হবেই গো। একলার সংসার ওর, যত্ন-আত্তি করার তো আর লোকজন নেই, তা দোষ দেবে কাকে?

কেষ্টর মা-র কথা শুনে যেন জ্বলে উঠলেন নীরজাসুন্দরী। ও মেয়েমানুষটার কথাই ওই রকম। একটা মাত্র মেয়ে, তার হাল হয়েছে ওই। মার মনে দুঃখ হবে না? তাই যদি না হবে তবে, গর্ভধারিণী মা বলে শাস্ত্রে কথাটা আছে কেন?

কেষ্টর মা বললো—তা মেয়েকে এবার ভালমন্দ খাওয়াও। খাইয়ে তর-তাজা কর।

তা আর খাওয়াবেন না নীরজাসুন্দরী? বলতে গেলে এ সংসারের ভাবী মালিক তো ওই মেয়েই। দুধটা, মাছটা খাইয়ে মেয়ের স্বাস্থ্য না ফেরালে, ছেলেপুলে হবার সময় কি বিপদ হয়ে পড়বে, কে জানে? কেষ্টর মার কথা শুনে রুষ্ট হয়েই বললেন যা মনোরমা, যা। দুটি জলপানের বন্দোবস্ত কর।

কেষ্টর মাকে পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠালেন মিষ্টি আনতে। মনোরমা বসলো লুচি ভাজতে। শুধু লুচি মিষ্টিও দেওয়া যায় না জামাইয়ের পাতে। সঙ্গে একটু পায়েসের ব্যবস্থাও করতে হলো।

গুনীনের জলখাওয়া হয়ে গেলে গরজ করে যমুনাই এগিয়ে এলো। তখন অবশ্য নীরজাসুন্দরী কাছে ছিলেননা। যমুনা বললো--সন্ধ্যে হ'য়ে এলো প্রায়। একটু না হয় ঘুরে এসো গিয়ে।

—একলা একলা কোথায় যাবো? গুনীন বললো।

—নদীর ধারটার দিয়ে একটু ঘুরে এসো না হয়।

—দেখি। একটা সিগারেট ধরালো গুনীন।

— দেখিনা, যাও। শ্বশুরবাড়ি এসে ঘরের কোণে বসে থাকে নাকি কেউ?

একমুখ ধোঁয়া যমুনার মুখের ওপোর ছেড়ে দিয়ে গুনীন বললো - দোকলা যখন নেই, তা তুমিই চলো না?

—ইস্, শখ দেখ না! যা-হাল করেছ আমার? এখন থেকেই মার প্রায় কান্নাকাটি লেগে গেছে।

—দেখি, খপ্ করে যমুনার আঁচল চেপে ধরলো গুনীন—দেখি দেখি হালটা কি রকম হয়েছে?

এক ঝটকায় সরে দাঁড়ালো যমুনা, বললো—ছিঃ ছিঃ! লজ্জা-শরমের বালাই বলে যদি কিছু থাকে। আবার দরদ দেখ না, ছ' মাসে ফিরে তাকালো না একবার, এখন হলো সময়। থাক।

আর কথা বাড়ায়নি গুনীন। তাড়াতাড়ি সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—তাই ভালো। একটু ঘুরেই আসা যাক।

নীরজাসুন্দরী যে লক্ষ্য করেননি, তা নয়। মেয়েই ঠেলে পাঠালো জামাইকে। তা দেখে তাঁর মনেও একটা পুলক স্পন্দিত হয়ে উঠলো। জামাই বশ হয়েছে মেয়ের। স্বামী যদি স্ত্রীর বশে না আসে, সে সংসারে কি সুখ হয় নাকি? সেদিক দিয়ে যমুনা ভাগ্যবতী।

প্রথম বয়সের কথা বাদই না হয় দেওয়া গেলো, তারপর কর্তা বরাবরই বাধ্য ছিলেন নীরজাসুন্দরীর। তাই বলে যে মাঝেমধ্যে নিজের খেয়াল খুশি মত না চলতেন, তা নয়। ওটুকু স্বাধীনতা মধ্যেমধ্যে না দিলে কি ওঁদের মন বাঁধা যায় নাকি? কথায় বলে পুরুষমানুষ বাঘের জাত। যেমন ছেড়ে দেবে, তেমনি শেকল পড়াবে। মাঝে মাঝে না ছাড়ল ওদের মোহ থাকবে কেন? কিন্তু বেশি ছেড়ে দিয়েছ কি, বিপদের কথা।

মেয়েটার সেদিক দিয়ে ভাগ্য ভালো। তা যমুনা রূপেরঙে তো আর ফেলবার মত নয়? বেশ সুন্দরই দেখতে। দাপটের কথাই যদি ওঠে, তা একটু দাপট না থাকলে কি মেয়েরা সুখ পায়? কর্তা বলতেন—তোমার মেয়ের যা গো এখনই, বড় হ'লে জামাইকে ও নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।

নীরজাসুন্দরী বলতেন—তা কি বলা যায় নাকি?

সত্যিই বুঝি সে কথা বলা চলে না। ভাগ্য বলে একটা কথা রয়েছে। কত সুন্দরীর কত সংসার ভেঙে গেলো। আসলে সেরকম মন যেমন চাই পুরুষের, তেমনি চাই মেয়েদের সহ্যগুণ। এ হলো ইঞ্চি মেপে কাজ। একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি, ভাঙন ধরলো। নীরজাসুন্দরী বলতেন—ইস্! কি আমার গনকঠাকুর এলেন রে, আগেভাগেই বলে দিচ্ছেন সব?

কর্তা হাসতেন। হুঁকা টানতে টানতে হেসে বলতেন—যেমন মা,

তার তেমনি মেয়ে হবে না? মায়ের চলায়-বলায় ঝাড়, মেয়ের কি বাদ যাবে?

—দেখ, মিছা কথাগুলো অমন করে আর বোলো না। আমি তোমার করেছি কী? একটু অভিমানের রঙ নীরজাসুন্দরীর চোখেমুখে।

—এই দেখ, তুমি অমন চটে উঠছো কেন? কথা হচ্ছে তোমার মেয়ের।

—না, আমি যেন ভাত খাই না, বুঝিনা কিছুই? মেয়ের কথা তুলে আমাকে ঠেস্ দিয়ে কথা বলা হচ্ছে।

—থাক, থাক। চুপ করে যেতেন কর্তা।

কর্তা যে একেবারেই বাজে কথা বলতেন, তা নয়। যমুনা যে এমনটি হবে সে সম্ভাবনা নীরজাসুন্দরীও আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। নিজের চোখেই তো দেখেছিলেন? সেই শত্রু বিশু, তাকে কি হেনস্তাই না করেছে মেয়ে। মারামারি, কাটা-কাটা কথা শোনানো, এমন কি গালমন্দ পর্যন্ত। দেখে সে সময় হাসিই পেতো নীরজাসুন্দরীর। হেনস্তা বলে হেনস্তা! ছেলেটা চোখে-মুখে পথ পেতো না। আর ছেলেটাও ছিলো। একেবারে মাটির মানুষটি। সাত চড়ে মুখে রা নেই। যমুনা যেমনটি বলতো তার এক পা এদিকওদিক করতো না।

ভেবে ভেবে কুল কিনারা পান না নীরজাসুন্দরী। মেয়ের ধরণ ধারণ দেখে চিন্তার অন্ত নেই। শুধুই মনমরা হয়ে থাকে যমুনা। না বলে তেমন কথাবার্তা, না একটু ঘোরাঘুরি। চুপচাপ একলা বসে থাকে। গুনীন চলে গেছে তাও দিন দশেক। এই ক-টা দিনের মধ্যে কিছুতেই মেয়ের মনের নাগাল পাচ্ছেন না তিনি। কী যে বসে বসে ভাবে, মেয়েই জানে।

এতদিন পরে আবার খুঁজে পেতে বের করেছে সেই পুতুলটা। অথচ যত্ন করে ওটা লুকিয়ে রেখেছিলেন নীরজাসুন্দরী। ছোট বয়সে পুতুলটুতুল, খেলনা-টেলনা নিয়ে মেয়েরা খেলাধুলা করেই। বলতে গেলে ওগুলো হচ্ছে ভবিষ্যতের ঘরকন্নার প্রস্তুতি। কিন্তু বড হবার পর মেয়ের অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখে দেখে গা জ্বালা করে উঠছে নীরজাসুন্দরীর।

ক-দিন চুপচাপই ছিলেন, কিন্তু শেষকালে আর চেপে রাখতে পারলেন না নিজেকে। বললেন—তোর হোলো কি রে যমুনা? বসে আছিস তো আছিসই। একটু নড়াচড়া, হাঁটাহাঁটি করে বেড়া। পেথ্থম পোয়াতি মানুষ, শুয়ে বসে থাকলে হবার সময় বুঝবি কেমন ঠ্যালা।

যমুনা বললো—বড় দুর্বল লাগে আমার।

—তা লাগুক। তাই বলে বসে থেকেথেকে নিজের কষ্ট নিজে ডেকে আনবি?

আসলে পুরোপুরি দুর্বলতা নয়। বিয়ের পর থেকে লক্ষ্য করেছে যমুনা, নিজে নিজেই বুঝেছে, এ গ্রামে পা দিলে মনটা আপনা থেকেই কেমন যেন হয়ে যায়। একটা আশ্চর্য তন্ময়তা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ওকে। শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ স্বামীর কাছে যতদিন থাকে, এখানে আসবার জন্য মন আনচান করে। আবার এখানে এলেও নিজের মনের থই পায় না। এ এক আশ্চর্য জ্বালা হয়েছে যমুনার।

ডল পুতুলটার সঙ্গে যে ওর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। কৈশোর থেকেই সে স্মৃতির সুরু। মায়ের কাছে শুনেছে যমুনা, ও যখন ছোট ছিলো, মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছিলো কালীঘাটে। সেখানেই পুতুলটা কিনে দিয়েছিলেন বাবা। কৈশোরের অপরিণত মনে ও স্বপ্ন দেখতো, এই ডলপুতুলটার মত একটা ছেলে হবে ওর। দেখতে হবে ঠিক এমনিই, আর চোখ দুটো হবে ঠিক এমনি টানাটানা। সেই স্বপ্ন বড হয়েও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। হয়তো পারতো কিন্তু বিশ্বনাথই ওকে ভুলতে দেয়নি। সে যে বড় ভালবাসতো এই পুতুলটাকে। কিন্তু পুতুলটাকে নিয়ে আজ তেমন করতে কেমন যেন কুণ্ঠিত লজ্জায় ভেঙ্গে পড়ে যমুনা। বিয়ের আগে যে পুতুলটাকে নিয়ে অনায়াসে যেমন তেমন খেলতে পারতো ও, আজ সেসব যেন নিতন্তই ছেলে-মানুষী বলে মনে হয়। কিন্তু তবুও একদিন বিছানায় বসে আকাশ-পাতাল যখন ভাবছিলো যমুনা, হঠাৎ চমকে উঠেছিলো ও।

হ্যাঁ, হঠাৎ ও দেখতে পেয়েছিলো সেই ডলপুতুল, ওর আবাল্যের সম্পদ। দেখে ভয়ানক চমকে উঠেছিলো। আশ্চর্য! অনেকদিন, অনেক যুগ পরে যেন কুড়িয়ে পেলো ক' দিন আগেকার এক টুকরো জলন্ত স্মৃতির স্বাক্ষর। এ শুধু পুতুল নয়, ওর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আর একটা মানুষের স্মৃতি। সে স্মৃতি কত অন্তরঙ্গ! সে মানুষ আজ নেই। নেই বলেই বুঝি এত মূল্যবান মনে হচ্ছে পুতুলটাকে। আসলে এটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। ওর মধ্য দিয়ে হঠাৎ যেন আর একজনের স্মৃতি দপ্ করে জ্বলে উঠলো যমুনার মনে।

দেওয়ালের হুঁকের সঙ্গে ঝোলানো একটা শাদা কাপড়ের পুঁটলীর ভেতর থেকে একটা অংশ আগে দেখেছিলো যমুনা। তারপর পুঁটলী পেড়ে নিয়ে

পুতুলটাকে উদ্ধার করেছিলো। সেই থেকে এই ক'দিন ধরে যমুনা ভাবছে। শুধুই ভাবছে। ভাবতে ভাবতে কেমন একটা অজানিত ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। কিছুতেই মনপ্রাণ খুলে সহজ হতে পারছে না।

এই ভয়ের পেছনে একটা কারণ যে নেই, তা নয়। সে কথাটা মনে হয়েছে বিয়ের পর। বিয়ের কয়েকদিন মাত্র আগে একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলো যমুনা। তার পেছনেও অনেক কারণ রয়েছে। কিন্তু সেই কথা নিয়ে গ্রামে দু-একজন যে আলোচনা করেনি, তা নয়। কেষ্টর মার মুখে শুনেছে গ্রামের কেউকেউ নাকি বলাবলি করছে। বলেছে, এর জন্য নাকি যমুনাই দায়ী। যমুনার জন্যই পালিয়েছে বিশ্বনাথ। তা নইলে এত বিষয়-সম্পত্তি, এত টাকাকড়ি সব ফেলে অনায়াসে একটা মানুষ কী করে চলে যেতে পারে ?

কিন্তু যমুনা চায়নি তার জন্য কেউ পালিয়ে যাক। যেতে তো আর বলেনি ? বরং তাকে আটকে রাখতেই চেয়েছিলো, বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেছিল চিরকালের মত। কিন্তু সমাজের অনুশাসন অনুযায়ী সে স্বপ্ন সফল হয়নি। তা নইলে শেষ দিকে সে লোকটা কি করে এ পথ মাড়ানো বন্ধ করে দিয়েছিল ? আর যমুনাও কোনদিন ভাবে নি এমন করে ডুব দিয়ে থাকতে পারবে বিশ্বনাথ। যমুনাকে ছাড়া যার একটা দণ্ড কাটতো না, তার সম্পর্কে এরকম ধারণা অনায়াসেই করা যেতে পারে। আজ যারা বলছে, বলে বেড়াচ্ছে, তারা কি একটিবারও ভেবে দেখেনি যমুনার সে দিনের অবস্থা ?

ওই একটা ভয়ের জন্যই বেরুতে ইচ্ছে করে না। আগেরবার তবুও গ্রামের দু' একটা বাড়ি ঘুরেছে কিন্তু এবার একেবারে ঘরের কোণ বেছে নিয়েছে যমুনা। সেবার দাস বাড়ির আশাদির কাছে গিয়েছিলো যমুনা। বিয়ের পর দু'জনের অনেক কথা হলো। কিন্তু সব কথার শেষে, এমন যে বন্ধু আশাদি, সেও দোষারোপ করলো যমুনাকে। বললো—কিছুতেই আটকে রাখতে পারলি না ?

—না।

—তা হ'লে ?

এই তা হ'লের প্রশ্নে সেই সমস্ত রাত ধরে ভেবেছে যমুনা। কতবার যে সে কথা ভাবতে বসে ওর বুকটা টন্‌টন্‌ করে উঠেছে তার সীমা নেই।

কিন্তু ভেবেও কোন সমাধানের ইঙ্গিত পায়নি। তাই এবার এই ঘরটাকেই জগৎ করে তুলেছে। স্নান খাওয়া আর বিকেলে দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসা। বাইরের সঙ্গে এইটুকুই সম্পর্ক ওর। কিন্তু কি করে মাকে বোঝাবে মনের এই যন্ত্রণার কথা? কেমন করে প্রকাশ করবে? হাঁটা চলার জন্য দিনরাত মা বলছেন, ওরই কি ইচ্ছা হয় না? হলে কি হবে, যমুনা পারবে না, কিছুতেই এই জগৎ ছেড়ে আলোর মুখোমুখি হতে পারবে না। অন্ধকারে লুকিয়ে সমস্ত কলঙ্কের কালিমা নিয়ে বেঁচে থাকবে।

এ একটা দুঃসহ জ্বালা। স্বামীর কাছে যখন ছিলো, তখনও এই জ্বালার বহ্নিশিখার ছোকছোক তপ্ত স্পর্শে ও জ্বলেছে। আজও অক্ষয় মহিমায় সেই জ্বালার বহ্নি দহন করছে ওকে।

পুরো তিনটা মাসও কাটলো না, হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় লক্ষণ দেখা গেলো। দেখে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন নীরজাসুন্দরী। কী যে করবেন ভেবে পেলেন না। অসময়ে, একেবারে সাঁঝ-সন্ধ্যেবেলায় ব্যথা উঠেছে যমুনার। ব্যথায় মেয়েটা পড়ে পড়ে ককাচ্ছে।

একবার কাছে যাচ্ছেন, একবার ছুটে এসে বাইরে দাঁড়াচ্ছেন নীরজা-সুন্দরী। মেয়ের কাছে বসে দু'দণ্ড গায়ে মাথায় হাত বুলোবেন, সে ধৈর্যটুকুও লোপ পেয়েছে। মনোরমা এসেছে, কোমরে হাত বুলোচ্ছে যমুনার যন্ত্রণায় কাটা মাছের মত ধড়ফড় করছে মেয়েটা।

বারান্দায় এসে হাঁক দিলেন নীরজাসুন্দরী—কৈ লো কেষ্টর মা, গেলি কোথায়? বলি মেয়েটা আমার মরতে বসেছে, আর তোরা সব কে কোথায় রইলি?

পাশেই ছিল কেষ্টর মা। হাঁক শুনে এগিয়ে এলো সে, বললো—অত ব্যস্ত হয়োনা মা। ব্যস্ত হবার কি আছে? বলি তোমারও তো হয়েছিলো না-কি? না, এমনিতেই কুড়িয়ে পেয়েছ সব?

তা আর হয়নি? সবগুলো বেঁচে থাকলে আজ সংসার ভ'রে যেতো নীরজাসুন্দরীর। কিন্তু মায়ের প্রাণ তো, অত সহজে কি আর বুঝ মানে? তাই বললেন,—বুদ্ধিশুদ্ধি যা দেবার তা পরে দিস। এখন দেখ তো দাই-টাই ডেকে আন। মেয়েটা কতক্ষণ জ্বলবে?

—তুমিও দেখি মেয়ের মত ছেলে মানুষটি হয়ে গেলে। ব্যথা উঠলেই

কি সঙ্গেসঙ্গে হয়ে গেল নাকি? কথায় বলে এর নাম জন্মব্যথা। কষ্ট কি আর কম মা-গো! কিন্তু ওই, শোধ নিয়ে তবে ছাড়বে।

বেশিক্ষণ কথা শোনবার উপায় নেই নীরজাসুন্দরীর। কেষ্টর মা-র ওই এক রোগ। একবার কথার সুরু করেছে কি, বকর বকর আর শেষ হবে না। মেয়েটা ওদিকে মরে, কোথায় তাড়াতাড়ি দাই ডেকে এনে বন্দোবস্ত করবে, তা-না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বক্তৃতা শোন।

ত্বরিতে ঘরে ছুটে এলেন নীরজাসুন্দরী। এসে বসলেন মেয়ের পাশে। দাঁত মুখ চেপে থেকেথেকে মেয়েটা যন্ত্রণায় ধড়ফড় করছে। আর্তনাদ করে উঠছে মাঝে মাঝে।

যমুনার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন নীরজাসুন্দরী—সহ্য কর মাগো, সহ্য কর। ভয় কি? আমরাতো রয়েছিই।

মনোরমা কোমরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো যমুনার। উল্টে এসে তাকে শুদ্ধু নীরজাসুন্দরীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো যমুনা, বললো—না না, আর পারি না মাগো, পারি না।

চোখদুটো প্রায় ছলছলিয়ে উঠেছিলো নীরজাসুন্দরীর। এর মধ্যেই দাই নিয়ে এলো কেষ্টর মা। মেয়েকে এবার এঘর থেকে ওঘরে পাঠাতে হবে। কি করে যে নিয়ে যাবেন, সেই কথাই ভাবছিলেন। বিধবা মানুষ। তাঁর আচার-নিয়ম, পূজো-আচার ঘর এটা। শোনও এটাতেই। এঘরে তো আর ওসব হতে পারে না। শেষকালে অনেক কষ্টে, সকলে ধরাধরি করে যমুনাকে নিয়ে যাওয়া হলো অন্য ঘরে।

কিন্তু ভ-ভারতেও এমন কথা শোনেন নি নীরজাসুন্দরী। সমস্তটা রাত চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। সারা রাত ধরে মেয়েকে নিয়েই অস্থির। কিছুতেই আর হয় না। ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এক রকম পাগলই হয়ে উঠেছিলেন। কিছু যে করবেন তারও উপায় নেই। শুধু চিন্তা আর ভাবনা।

শেষ রাতের দিকে ব্যথাটা কমলো যমুনার। সেই অবসরে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিয়ে গা-গতর ঠাণ্ডা করতে পারতেন কিন্তু ওই, মন চাইলো না। একটা সংশয় তখনও মনের মধ্যে। কিসে কখন কি হয়, কে বলবে?

পরের সারাটা দিনও গেলো। কখনও কমে আসছে, কখনও পরিত্রাহি

চিৎকার করছে মেয়ে। শেষকালে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার এসে প্রথমটা দেখে যেমন চোখ দুটো কোঁচকালো, তা দেখেও মাথা খারাপের মত অবস্থা। ওষুধ দিয়ে ডাক্তার বলে গেলো—কষ্ট হবেই, প্রথম তো? চিন্তার কোন কারণ নেই। ইঞ্জেকসন দিয়ে গেলাম সব ঠিক হয়ে যাবে।

দিন গিয়ে সন্ধ্যা, তারপর রাত। নীরজাসুন্দরী আর ওঘরে যান নি। সন্ধ্যার পর সেই যে ঠাকুরের আসনের সামনে বসেছিলেন, আর উঠবার নাম নেই। ঠাকুরের সামনে কত মানত, কত মাথা খুঁড়লেন। কালীঘাটের মা-কে স্মরণ করে মানত্ করে বললেন—মা-গো রক্ষা কর। নিস্কৃতি দে মা মেয়েকে। এক টাকা স-পাঁচ আনার পূজো দেব তোর, আর কষ্ট দিস না মা। বুড়োশিবতলার বাবাকে ডাকলেন, নারায়ণের পূজো, নাটাই ষষ্ঠীর পূজো মানত করলেন আর মাথা খুঁড়লেন। তারপর এক সময় তাঁর মনে হলো কে যেন তাঁকে ডাকছে!

হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন তো, ছিলেনই। প্রথমবার সাড়া দেননি। তারপর বার কয়েক ডাক। এবার সোজা হয়ে বসলেন নীরজাসুন্দরী। তাকালেন। দেখলেন কেষ্টর মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

ছলাৎ করে বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। কম্পিত স্বরে নীরজাসুন্দরী বললেন—কিছু হলোরে?

—হ্যাঁগো।

আসনের সম্মুখ থেকে এবার উঠে এলেন নীরজাসুন্দরী। এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে।

কেষ্টর মা বললো—নাতি হ'য়েছে গো মা। পুত্তুর।

অন্ধকার রাত্রির শেষে হঠাৎ যেন সূর্যোদয় হলো। সেই আলোই ফুটে উঠলো নীরজাসুন্দরীর চোখেমুখে। স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে তিনি বললেন—ভালভাবেই হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, কষ্ট হয়নি।

কষ্টটাই বা হলো না কিসে? কতগুলো প্রহর যে এই দুদিনে কেটেছে, কে হিসাব করেছে তার?

নীরজাসুন্দরী পড়িমরি করে যেন ছুটে এলেন আতুড়ের সামনে। মনোরমা তখনও বেরোয়নি। দাই বুঝি আগুনের মালসা নিতে বাইরে এসেছিলো, তাঁকে দেখে দাই বললো—চাঁদমণি পুত্তুর হয়েছে গো মা।

স্বস্তি পেলেন নীরজাসুন্দরী। দু দিন ধরে কি ভাবনাটাই গেছে! না পেরেছেন ঘুমোতে, না শান্তিতে একটু বসতে। মেয়েও কি কম নাকাল নাকি? পুরো মাসে হলো না, ন-মাসে হঠাৎ ব্যথা! সাধে কি আর ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়েছেন? খুঁড়েছিলেন বলেই না অত সহজে হ'য়ে গেলো। সবই ভগবানের হাত। আর মজাটাও দেখ, ঠাকুরের আসনে হত্যা দিয়ে কেঁদেছেন কি, অমনি ডাক। শুনলেন হ্যাঁ, হয়েছে। তাঁর কৃপা না থাকলে কি আর অমন হয় নাকি?

যে যে দেখতে এসেছে, সকলকে ডেকে ডেকে ওই কথাটাই শুনিয়েছেন নীরজাসুন্দরী। বলেছেন—যেই না আসনে মাথাটা নামিয়েছি, ব্যস্। অমনি ডাক। আমি ভাবিকি তিনিই বুঝি ডাকছেন। ওমা! তাকিয়ে দেখি কেষ্টর মা! শুনি, ছেলে হয়েছে চাঁদমণি। তা তোমরাই দেখ গো মা, ওই যদি মাথা না খুঁড়তাম, তবে কি অত সহজে দয়া হতো তাঁর?

একমাসের অশৌচ কাটিয়ে যমুনা বেরুলো। এবার নিজের ঘরে নিয়ে এলেন নীরজাসুন্দরী। নাতি কোলে নিয়ে বসলেন, বললেন—ওমা! কী সুন্দর হয়েছে গো। একেবারে কত্তার মুখটি ভগবান বসিয়ে দিয়েছেন যেন। তারপর ছেলেটাকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন—কী গো কত্তা, ফিরে তো এলে কিন্তু এখন কি আর এ বুড়িকে জায়গা দেবে পাশে?

শিশুটি হাত পা নাড়ালো।

হেসেই মরেন নীরজাসুন্দরী। ডাকলেন মনোরমাকে, কেষ্টর মাকে। তারপর যমুনাকে বললেন—অ যমুনা, যমুনা, দেখ। আয় দেখে যা তোর ছেলের কাণ্ড। ওমা! ওইটুকু ছেলে, আমার কথা শুনে হেসেই বাঁচে না। আবার ছেলেটাকে নাচিয়ে বললেন—পছন্দ তাহ'লে হয়েছে?

মনোরমা বললো—তা ভাসুর ঠাকুর তো এলেন, এখন আমি কি করি গো দিদি? কি বলে, ভাসুরের সামনে ভাজবৌ কি আর বিনা ঘোমটায় আসা যাওয়া করতে পারে?

—যা বলেছিস মনো, পুলক ছড়িয়ে নীরজাসুন্দরী বললেন—তোর তো মনেই আছে লো? ছেলেটাকে এবার তুলে ধরে বললেন—দেখ দেখি কত্তার মুখখানা নয়?

কেষ্টর মা পাশ থেকে বললো—কর্ত্তা কোথায় গো মা? ওযে দাদাঠাকুর গো। তা যাই মনে কর না মা, তোমার কর্ত্তাও এমন সুন্দর ছিলো না।

মোক্ষম অস্ত্রে এবার কাত হয়ে পড়লেন নীরজাসুন্দরী। মুহূর্তে মুখটা যেন কালো হ'য়ে গেলো তাঁর। তিনিও ছাড়বার পাত্রীটি নন। আঘাত খেয়ে বললেন—ছোটকালে চটক একটু থাকবেই লো। বড় হোক, দেখবি তখন।

চুপচাপ বসেছিলো যমুনা। ওদের কথা শুনে হেসে উঠতে পারতো সে। কিন্তু কেমন যেন তন্ময় হ'য়ে বসে রয়েছে। অন্য কথা ভাবছে যমুনা। হঠাৎ এসব কথার মধ্যে ওর মনে একটা ছবিই ভেসে উঠলো। মনে পড়লো ওর সেই ডলপুতুলের কথা।

পাঁচ

অন্ধকার রাত্রি। চারদিকে অমাবস্যার থম্‌থমে অন্ধকার। সম্মুখে কুলুকুলু একটানা একটা শব্দ। রূপনারায়ণের জোয়ারের জল খরবেগে এগিয়ে চলেছে। পার ছাপিযে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আর সেই একটা আশ্চর্য শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে, এই নির্জন প্রান্তরে। যদিও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তবুও শব্দটা শুনতে পারছে বিশ্বনাথ। মাঝে মাঝে জলস্রোতের মধ্যে রূপালী রেখার মত একটা ঝিকিমিকি আলো বিদ্যুৎ চমকের মত চমকে চমকে উঠছে, ঝলকাচ্ছে, ও দেখতে পেলো।

অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চল বসে রয়েছে বিশ্বনাথ। দু হাঁটুর মধ্যে হাত দুটো আড়াআড়ি করে তার মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন নিঃশব্দে কাঁদছে ও। কেঁদে কেঁদে হতাশ হযে পড়েছে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় নিস্তরঙ্গ কান্নার আকৃতিতে নিষ্প্রাণ পাথরের মত জড় হয়ে গেছে যেন ও।

কিন্তু না, কাঁদছে না। কাঁদছে না বিশ্বনাথ। আজ থেকে কতদিন আগে মনে নেই, ওর চোখের জলের শেষ বিন্দু পর্যন্ত শুকিযে গেছে। শেষ হ'যে গেছে। আজ আর কান্না আসে না। কাঁদতে চাইলেও দু এক ফোঁটা জল টলমল করে ওঠে না চোখের কোলে। ও এখন নিষ্করু নূতন। যত ভাল যত খারাপই হোক, তবুও জীবনে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছে ও। এ যেন বিশ্বনাথের পুনর্জন্ম। ভুলেও কখনো গতকালের স্মৃতি নিযে টানাটানি করতে চায় না। চায় না পুরনো, ফেলে আসা দিনের কথা ভাবতে। কিন্তু না চাইলেই যে ছাড়া পাবে তারও কোন মানে নেই। তাই যতবার ও ভুলতে চায় তার চেযেও অনেক বেশি মনে পড়ে।

কিছুক্ষণ আগেই হাঁপাচ্ছিলো বিশ্বনাথ। এতটা পথ ছুটে এসে ধড়ফড় করছিলো ওর বুক। ধড়ফড় করছিলো একতালে। না ভয় নয়, অথবা এ ঘটনা ওর জীবনে, মনে এমন কিছু একটা বিস্ময় বা বিভীষিকার সূত্রপাত করতে পারে নি। কিন্তু তবু ও ছুটে এসেছে। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িযে না পড়লেও দেহের খাঁচার মধ্যে পাখি-মনটা কাঁদছে। সদ্য সন্তানহারা মাযের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতে পারতো, কিন্তু তেমন করে কে কাঁদে

বা কেঁদেছে সে কথাটাও স্মরণ নেই ওর। আর সেই জন্যই নিস্তরঙ্গ কান্নাকে ছাপিয়ে কণ্ঠ সজীব হতে পারছে না। কান্নায় "চোখের জলে বুক ভাসানো" কথাটা বেমালুম বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।

যদিও বিশ্বনাথ জানতো, এই ধূ ধূ প্রান্তরে মণিকা নামে কোন মেয়ে কোনদিনও ফিরে আসবে না। মাত্র দুটো দিন আগের মত মণিকা এসে ওর গায়ের ওপরে লুটিয়ে পড়ে হু-হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে না। মন গলাবার ছলনায় আদর করে জড়িয়ে ধরবে না আর একটিবারও। তবু এই খানেই বসে রয়েছে বিশ্বনাথ। দু হাঁটুর মধ্যে আড়াআড়ি করে রাখা একজোড়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে ও কাঁপছে। ভাবছে। ভাবতে বসে কুল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু তবুও একটা মুহূর্তের জন্য নিজেকে অসহায় মনে হয়নি। সমস্ত কিছু হারিয়ে আজ এই মুহূর্তে ও যে পথের ভিখারী হয়েছে সে কথাও নয়। শুধুই ওর মনে পড়েছে মণিকার কথা। মণির কথা। আর সেই কথা চিন্তা করতে গিয়ে এই কঠিন রাত্রির নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে রূপনারায়ণের তীরে বসে কেমন একটা আশঙ্কায় ওর মন দুলছে। সেখানে কেউ নেই। জন মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই ধারে কাছে।

ভেবেভেবে বিশ্বনাথের মনটা যত বেদনাহত হতে চাইছিলো, তত বেশি মন ফেরাবার চেষ্টায় নিজের মনের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করছিলো ও। স্মৃতির পর্দা থেকে মুছে ফেলতে চাইছে ও মণিকার নাম। ভুলবার অদম্য চেষ্টায় যুদ্ধ করছে অহরহ।

এক সময় হাঁটুর ওপোর ভর করা আড়াআড়ি রাখা হাতের অন্ধকার থেকে মুখ তুললো ও। তাকাল রাত্রির অন্ধকারে মধ্যে। যদিও নিজেই বুঝতে পারলো না, তবুও ভাবলো ও কি অন্ধ হয়ে গেছে! মুখতুলে তাকাতে গিয়ে প্রথমটায় ভয়ানক অন্ধকার মনে হলো। তারপর নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনি শোনবার জন্য কান পেতে, চোখ খুলে অনেকক্ষণ বসে রইলো। এক সময় মনে হলো একটু যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! অন্ধকার ফিকে ফিকে লাগছে এখন! তাকিয়ে রইলো বিশ্বনাথ। তাকাতে পেরে ওর মনে হলো নদী আর ওর মধ্যে তফাৎটা কী!

রূপনগর থেকে যেদিন রাত্রিতে ও পালিয়েছে, সেই থেকেই সুরু হয়েছে ওর উদ্দাম যাত্রা। কোথাও থেমে থাকতে চায়নি ও। তরতর করে এগুতে এগুতে এই ক বৎসরের মাথায় এসে থেমেছে। ক বৎসর আগে রূপনগরের

জমিদার বাড়ি থেকে গভীর রাত্রিতে বেরিয়ে পড়েছিলো একটা মাত্র চামড়ার স্যুটকেশ সম্বল করে। তারপর উদ্দাম পাহাড়ী নদীর মত খরবেগে চলতে চলতে কোথা দিয়ে যে এই সুদীর্ঘ সময়টা পার হ'য়ে গেছে নিজেই বুঝতে পারছে না। হিসাব করতে পারছে না। কিন্তু বুঝতে না পারলেও এ সময়ে যত দুঃখ, যত সুখ-আনন্দ ও পেয়েছিলো সে সব একেবারে যে মন থেকে মুছে গেছে তা নয়।

হ্যাঁ, একটা চামড়ার স্যুটকেশ সঙ্গে ছিল ওর। খুব দামী চামড়ার। তাতে কয়েকটামাত্র জামা কাপড় আর টাকা। হ্যাঁ, নোটে খুচরোয় প্রায় সাতশো টাকা। তার সবগুলোই ওর নিজের। তাতে অন্য কারও একটা পয়সা পযন্ত ছিলো না। নেবার ইচ্ছা থাকলে বড-মার ট্রাঙ্ক থেকে অনায়াসে দু এক হাজার যে আরও আনতে না পারতো তা নয় কিন্তু বিশ্বনাথ তা চায়নি। তা থেকে কানাকড়িও সরায় নি ও। দিনেদিনে যে টাকা নিজে জমিয়েছিলো সেই টাকা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল অজানা পথে। ও টাকাগুলো জমিয়েছিলো তিল তিল করে। মহল থেকে প্রজারা দিয়েছে, দিয়েছে বড জমিদার। আর সব পেয়েছে ওর বডমার কাছ থেকে। যে একদিন ওকে দরিদ্র ঘর থেকে তুলে নিয়েছিলো অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে, যে ওকে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলো স্নেহবন্ধনীর মধ্যে আটকে রেখে।

কি খেয়াল হয়েছিলো সেদিন, ভয়ানক উত্তেজনায় অগ্রপশ্চাৎ কোন চিন্তা না করে বেরিয়ে পড়েছিলো বিশ্বনাথ। মধ্যরাত্রির নিঃশব্দে সমস্ত গ্রামটা যখন নিঝুম হয়ে পড়েছিলো, ঠিক সেই সময় রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে লাগলো ও। শুধু উত্তর দিকটা স্মরণ রেখে ও ছুটেছিলো। ডাইনে অথবা বাঁয়ে, কোনদিকে একটিবারও তাকায় নি। শুধু দিক ঠিক রেখে কখনও দৌড়ে, খুব শ্রান্তি লাগলে পায়ে হেঁটে, দ্রুতগতিতে চলে এসেছিলো বিশ্বনাথ।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন ও হাজির হলো সাপটগ্রাম স্টেশনে। এবার একলা নয়, সঙ্গে লোক রয়েছে। দিব্যেন্দু রয়েছে ওর সঙ্গে। বলতে গেলে দিব্যেন্দুই আবিষ্কার করেছে বিশ্বনাথকে। দিন কয়েক গোলোকগঞ্জ আর ধুবড়ী যাতায়াত করেছিলো বিশ্বনাথ। তখনই আলাপ। তারপর ওরা আরো একটু ঘনিষ্ঠ হলো। ছোটখাট একটা পান-সিগারেটের দোকান করবার আশায় ঘুরছিল দিব্যেন্দু। অল্প পুঁজি নিয়ে ওর চেয়ে বেশি আর কি করা চলে? সেই ঘোরাফেরার সময়েই আলাপ হয়ে গেলো। বিশ্বনাথেরও ভালো

লেগেছিলো ধুবড়ী। সেও ওই রকম একটা কিছু করবার মতলবে ঘুরছিলো। দু'জনেই যখন দু' জনের মনের কথা জানতে পারলো, তখন আর ব্যবধান থাকে নি। দিব্যেন্দু বললো—চলো, ভাবনা কি? দু' জনে মিলে ধান, সরষে, কলাইয়ের ব্যবসা করবো আমরা।

টাকা পয়সা দু' জনের যা ছিলো তাই নিয়েই স্বরু হলো ব্যবসা। আধা-আধি বখরা যেমন, ইনভেষ্টমেণ্টও তেমনি আধাআধি। খাওয়া পরার চিন্তা নেই। সে ব্যবস্থা দিব্যেন্দুই করলো ওর নিজের বাসায়। প্রথমটা আপত্তি করেছিলো বিশ্বনাথ। ও ভেবেছিলো ছোটখাট একটা ঘর ভাড়া নেবে আর হোটেলে খাবে। কিন্তু দিব্যেন্দু ঘোরতর আপত্তি করে বসলো, বললো—তা হয় না। ব্যবসাটাই বড় নয়। তুমি আমার বন্ধু সেইটাই বড় কথা।

প্রথম প্রথম ওরা দুজনেই ঘোরাফেরা করলো একসঙ্গে। একসঙ্গে কোন সাত-সকালে উঠে মফঃস্বলের গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষীদের কাছ থেকে মাল কিনতো। গরুর অথবা মোষের গাড়িতে সে মাল নিয়ে আসতো সাপটগ্রামে ওদের গোলায়। সপ্তাহের দুটো হাটে পাইকারী মহাজনদের কাছে মোটা লাভে বিক্রী করতো। কাজটা পরিশ্রম সাপেক্ষ যদিও কিন্তু প্রথম প্রথম মন্দ লাগেনি বিশ্বনাথের। রৌদ্রেজলে ভিজে শুকিয়ে ওই পাহাড়ী জনপদে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেও একটা আশ্চর্য রোমাঞ্চ রয়েছে বই-কি।

কিন্তু কি হলো, মনে আবার দুরন্ত ঝড় কথা কয়ে উঠলো। আড়াই বছর শেষ হ'তে না হতেই অস্থির হয়ে উঠলো বিশ্বনাথ, ভাবলো—না, আর নয়। আর এখানে নয়। ওর সেই যাযাবর মন আবার তাড়া দিল ওকে, বললো—চলো বিশ্বনাথ; সামনে এগোও।

তারপর ও একদিন বললো দিব্যেন্দুকে। বললো পরিষ্কারভাবে—আর টিকতে পারছে না ও এখানে। যাযাবরী মন ওর উন্মাদ হয়ে উঠেছে স্থানান্তরের নেশায়। কিন্তু কেন, কোন কারণে এই লাভজনক ব্যবসার মোহ কাটিয়ে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াতে চাইছে, সে কথা নিজেও বোঝেনি। কিন্তু এমন একটা বেদনায় আহত হয়ে পড়েছিলো বিশ্বনাথ যার জন্য ও টিকতে পারছিলো না এখানে। কিন্তু মুক্তি চাইলেই মুক্তি পাওয়া যায় না। দিব্যেন্দু ওকে সেদিন যেতে দিতে রাজি হয় নি।

দিব্যেন্দুর এই ছোট্ট সংসারে বড় বেশি আপনার হয়ে পড়েছে বিশ্বনাথ। দিব্যেন্দুর বৃদ্ধা মা, ওর বোন, ওর স্ত্রী সকলকে জড়িয়ে ও যেন বড় আপন হ'য়ে গেছে। দুটো আড়াইটে বৎসরের মধ্যে বিশ্বনাথ যেন এ বাড়ির ছেলে বলেই গণ্য হয়ে গেছে।

যশোহর জেলার কোন এক গণ্ডগ্রাম থেকে দিব্যেন্দুর বাবা পালিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষাদীক্ষা তেমন পেটে নেই। গ্রামদেশে মাছধরা আর গুণ্ডামী করে দিন কাটতো। বাবা সেটা সহ্য করেন নি। তাই সম্ভবতঃ ভাগ্যান্বেষী যুবক ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েন জলপাইগুড়ি-ভুটান সীমান্তে। অমন জঙলা দেশে সবেমাত্র তখন বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ের পত্তন হয়েছে। সবে তখন ট্রেন চলতে সুরু করেছে লালমণিরহাট থেকে মাদারীহাট। ঘন জঙ্গলে বাঘ-ভালুক হাতীর অভাব নেই। কোনো বাঙ্গালীই চাকরী করতে আসতে চায়না এ জঙ্গলের রাজত্বে। সেই সময় দিব্যেন্দুর বাবা ঢুকে পড়েন বি-ডি রেল কোম্পানীতে। তারপর ঘাটে ঘাটে বদলী, পদোন্নতি হ'তে হ'তে স্টেশন মাষ্টার।

কিন্তু ভদ্রলোক মারা গেছেন অকালে। দিব্যেন্দু তখন সবে ষোল বছরের। সাপ্‌গ্রামের স্কুলেই পড়তো দিব্যেন্দু। ক' বছরে কোন রকমে তেমনেট্রেনে ম্যাট্রিক পাশ করলো। বেশিই ঢোকাবার ইচ্ছা ছিলো মায়ের কিন্তু দিব্যেন্দুর তাতে অমত। ব্যবসা করবে ও। তিন তিনবার ব্যবসাতে নেমে সঞ্চয়ের ঘরে প্রায় শূন্য অবশিষ্ট রেখে ইস্তফা দিয়েছিলো। এবার আবার নূতন করে ব্যবসাতে নেমেছে বিশ্বনাথের সঙ্গে। এতগুলো ক্ষতির মূল্যে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ও, তাতে এমন লাভজনক ব্যবসা আবিষ্কার করতে বিলম্ব হয়নি।

কিন্তু দিব্যেন্দু এতদিন পারে নি। পারে নি অর্থাভাবে। ওর বাবার সঞ্চয় শেষ করে এনেছিলো ও।

আজ অনেক বৎসর পর রূপনারায়ণের তীরে অন্ধকারের মধ্যে বসে ভাবছে বিশ্বনাথ। সর্বস্বান্ত পথের ভিখারী আর ওর মধ্যে এই মুহূর্তে যদিও কোন পার্থক্য নেই, তবুও বিশ্বনাথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থির হয়ে রয়েছে। একটুও ভেঙে পড়েনি ও, বেঁচে আছে। আর আছে ওর রূপ। অসাধারণ রূপের ঔজ্জ্বল্য।

এই মনোরম রূপের জন্য যতটুকু পেয়েছে ও, হারিয়েছে তার চেয়ে অনেক। অনেক বেশি। আর এই কথা ভাবতে বসে শরাহত পাখীর মতই বুকের মধ্যে একটা আহত মন ছট্‌ফট্ করে। কিন্তু কল্যাণীকে কি চেয়েছিলো বিশ্বনাথ? না, কোন অজ্ঞান মুহূর্তে প্রেম নিবেদন করেছিলো গৌরীর কাছে?

গৌরীর এই রূপের মোহে আর দেহের আগুনে জ্বলেছিলো বিশ্বনাথ। কল্যাণীর শান্ত সমাহিত ভাব, নিস্তরঙ্গ সংযত হাসির মাধুর্য ওকে পাগল করে তুলতে পারতো। সেই দুর্বিসহ জ্বালা বয়ে হয়তো গৌরীকে নিয়ে পালিয়ে এসে তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে শান্তি পেতে পারতো কিন্তু বিশ্বনাথ তা চায়নি। এমন করে বন্ধুর সংসারে আগুন জ্বালাতে চায়নি।

যে দিন রাত্রিতে গৌরী এসেছিলো, ভীরু প্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিলো। তারপর আকুল কান্নায় বিশ্বনাথের বুকের ওপোর হুমড়ি খেয়ে ভেঙ্গে পড়ে বলেছিলো—চলো, আমাকে নিয়ে চলো তুমি। যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে যাও।

হ্যাঁ, নিয়ে আসতে পারতো। গৌরীকে নিয়ে অতি সহজে সেই রাত্রিতে যে কোন প্রান্তরে লুকিয়ে পড়তে পারতো। এমন সুযোগ আর আসবে না জানতো বিশ্বনাথ কিন্তু তবু সাহস হয়নি। ভয়ে ওর বুকের ভেতরটা বরফ-ঢ্যালার মত জমে আসতে চাইছিলো। কথা বলতে পারে নি বিশ্বনাথ। যদি একটু সায় থাকতো, কে রোধ করতে পারতো ওদের?

দিব্যেন্দু আর তার মাসতুতো ভাই সনৎ গিয়েছিলো মাঝরাত্রে মফঃস্বলের দিকে মাল কিনতে। ঘরে একলাই ছিলো বিশ্বনাথ। সেই শূন্য বাড়ির সুযোগে খুব সহজেই চলে আসতে পারতো ওরা দু'জনে। এসে বাঁধতে পারতো একটি নিটোল সুখের সংসার।

কিন্তু সে রাত্রিতে ক্ষণিকের জন্যেও মনে হয়নি এই অভাবনীয় মুহূর্তের মূল্যে এমন ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। যদি ওরা অথবা ওদের দু জনের কেউ একবার মুহূর্তের ভুলে অথবা সন্দেহের বশে ফিরে তাকাতো জানালার পথে, হয়তো দেখতে পেতো সেই রাত্রির নিথর স্তব্ধতা আর ফিকে অন্ধকারের মধ্যে মুক্তিপ্রার্থী আর একটা মেয়েমনের কেন্দ্রিত জ্বালা জলজল করে জ্বলছে চোখের তারায়। জ্বলে জ্বলে সে মনটা ক্ষয়ের সম্ভাবনার পথে দ্রুততালে এগিয়ে যাচ্ছে।

গৌরীর স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে বিশ্বনাথ বললো—না না, সে হয় না। সে আমি পারবো না।

সান্ত্বনয়ে আরও যেন ভেঙ্গে পড়লো গৌরী—শুধু আমাকে এই নরক থেকে বাঁচতে দাও। পথ দেখাও।

—পথ! পথ যে আমিই জানি না। হিল্ হিল্ করে উঠলো বিশ্বনাথ। কেমন একটা তপ্ত বহ্নিশিখায় ছলছলিয়ে উঠলো।

তারপর একসময় নিরাশ হ'যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপলো গৌরী। হয়তোবা অসম্ভব ক্রোধের আগুনে জলেজলে ফুঁসতে লাগলো। আর সেই জ্বালার শিখা দপদপ করে জলে উঠলো দু চোখের তারায়। শেষকালে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না গৌরী। গর্জে উঠলো। অনুচ্চ কণ্ঠে ফুঁসে উঠে বললো—তা হ'লে, তাহলে ·কথাটা শেষ করতেও পারেনি গৌরী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে বেরিয়ে গেলো।

সারারাত ধরেই চিন্তার কুজ্ঝটিকার মধ্যে হাবুডুবু খেলো বিশ্বনাথ। সে যেন অসীম অনন্ত এক অন্ধকারের রাজত্ব। আর তার মধ্যে বোবা আলোর মত মনেমনে ঘুরপাক খেতে লাগলো ও।

সারা রাত্রির নির্ঘুম জ্বালা সকালের দিকে একটু থিতিয়ে এসেছিলো। একটু আমেজ নেমে এসেছিলো ঘুমের। কিন্তু হঠাৎ বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়লো বিশ্বনাথ। উঠে ও দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। আবার সেই আর্ত-চিৎকার। দিবোন্দর বৃদ্ধা মা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠেছে।

দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এলো বিশ্বনাথ। আর বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেলো ও। কী! কী ঝুলছে ওর চোখের সম্মুখে!

কল্যানী ঝুলছে। এমন প্রকাশ্যে কল্যানী অনায়াসে ঝুলে পড়তে পেরেছে ফাঁসিতে। শক্ত দুপাটি দাঁতের চাপে ওর জিহ্বার অগ্রভাগ যেন আধকাটা। রক্তহীন ফ্যাকাশে জিহ্বাটার খানিক ঝুলে পড়েছে। ওর চোখদুটো ঠেলে ওপরে উঠবার পথে থমকে আটকে পড়েছে মাঝপথে বিস্ফারিত অবস্থায়। দুটো হাত দু পাশে টান টান হয়ে ঝুলছে আর শাড়ির ফাঁসিতে ঝুলছে কল্যানীর দেহটা।

সে দৃশ্য বীভৎস। কল্যানীর পরিধানে শাড়ি নেই। ঠিক হাঁটুর নীচ পর্যন্ত একটা সায়া পরনে, আর খাটো আঁটসাঁট একটা ব্লাউজ ওর গায়ে।

দেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়েছিলো বিশ্বনাথ।

আবার চিৎকার করে উঠলো দিব্যেন্দুর মা। চিৎকারই শুধু নয়। সে এমন একটা শব্দ বিশ্বনাথের মনে হলো ওর কানের পর্দাটা ফেটে এখনই বুঝি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে।

হ্যাঁ, বিশ্বনাথ লক্ষ্য করেছিলো—গৌরীও যেন বোবা হয়ে গেছে। শক্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে গৌরী। সে দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিলো বিশ্বনাথ। ওই বোবা দৃষ্টির আড়ালে গৌরীর মনের আনাচে কানাচে কোথাও কি উৎফুল্লের একটু স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে না? ও কি খুশি হয়নি একবিন্দু! বিশ্বনাথের মনে হলো গৌরীর ওই কাঠ হ'য়ে যাওয়া শুধুই মিথ্যা। যেন ও দেখতে পেলো গৌরীর মনের ভেতর উজ্জ্বলতম একটা খুশির বিন্দু চমকাচ্ছে।

কিন্তু কেউ এ রহস্যের সমাধান খুঁজে পায়নি। কল্যাণীর ওই আটসাঁট ব্লাউজের গলায় আধা-উঁকি দেওয়া একটা চিঠি পাওয়া গেছে। ওই চিঠিটাও একটা রহস্য। কল্যাণী চিঠিটা লিখে গেছে গৌরীকে। বেশি নয়, মাত্র কয়েকটা কথা লিখে গেছে কল্যাণী শেষবারের মত। ওর শেষ অক্ষর। কিন্তু ওই যে ক-টি কথা, কথার রহস্য, তার সমাধান কেউ খুঁজে পায়নি। দিব্যেন্দু পারে নি, পারেনি সেই থেকে শয্যালীনা ওর মা অথবা দিব্যেন্দুর মাসতুতো ভাই দীনেশ। তেমনি না বোঝার ভান করছে গৌরী। কিন্তু বিশ্বনাথের মনে হ'য়েছে গৌরী সবই বুঝতে পেরেছে কিন্তু এমন ভাব করে ও দাঁড়িয়েছে যেন সবচেয়ে ব্যথিত হ'য়েছে। বেদনায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে ওর। বেদনার মুখোশের আড়ালে এই কথাই বুঝি প্রমাণ করতে চাইছে গৌরী যে, কল্যাণী সংসারে ওকেই মাত্র আপনজন বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

গৌরীর যত বেশি রূপ, দিব্যেন্দুর তত কুরূপ। পঙ্কে পদ্ম ফোটার মতই একটা অসম্ভব সম্ভব হয়েছে দিব্যেন্দুর জীবনে। শুধু ওর বাবা স্বর্গীয় প্রমথেশ ঘোষের ছেলে বলেই বুঝি টিপকাই স্টেশনের স্টেশনমাস্টার নির্ভর ক'রে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন দিব্যেন্দুর সঙ্গে। ছেলে বলেই বুঝি রূপের প্রশ্ন তোলেন নি ভদ্রলোক।

এ বিয়েতে আহত হয়েছিলো গৌরী। মনেপ্রাণে মেনে না নেবার যন্ত্রণা বুকে পুষে নিস্তেজ হয়ে রয়েছে ও। একটি গোপন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন। একটু সুযোগ পেলে যে কোন মুহূর্তে ও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। আর দশটা

বাঙালী বিবাহিতা মেয়ের জীবনের মতই তুষের আগুন বুকে নিয়ে ধিকিধিকি জলছিলো গৌরী।

এ সংসারে দিব্যেন্দু যতখানি আপন, ততখানি অথবা তার চেয়েও কিঞ্চিতধিক বেশি আপন হয়ে পড়েছিলো বিশ্বনাথ। দিব্যেন্দুর বুড়ি মা থেকে দীনেশ, গৌরী, কল্যাণী সকলের সঙ্গেই সহজে মিলেমিশে গিয়েছিলো। কিন্তু ওই যে দুটো মেয়ে গৌরী আর কল্যাণী, বৌদি আর ননদ, ওদের দু' জনের মধ্যে আশ্চর্য ভাব দেখে অবাক হয়েছিলো বিশ্বনাথ। কিন্তু ও বুঝতে পারে নি একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে ওরা দুজনে ঘুরে মরছিলো। আগে আগে কল্যাণীই ঘর গোছাতো বিশ্বনাথের, সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখতো, প্রয়োজন মত ফাই-ফরমাস খাটতো। কিন্তু কেমন করে কবে থেকে একে একে সবটুকু গৌরীর হাতে তুলে দিয়ে নিঃশব্দে সরে দাঁড়িয়েছিলো কল্যাণী। সরে দাঁড়ালেও ওদের লক্ষ্য স্থির ছিলো একজায়গায়। আর পথও বুঝি একটাই। প্রথমটা ওরা একসঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু কেন যেন পেরে উঠলো না কল্যাণী। ঠিক খরগোস আর কচ্ছপের গল্পের মত। কিন্তু কচ্ছপের ধৈর্য নিয়ে গুটি গুটি এগুবার পরিকল্পনা করে হেরে গেলো একজন। আর না পারার দুঃখে নিজের মরণ নিজেই ডেকে আনলো অপঘাতে। আর খরগোস? না, সেও শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌছাতে পারে নি। নীতিবাদের গল্পের সঙ্গে জীবনের বাস্তব গল্পের এইখানেই ব্যবধান রয়ে গেলো।

না, তার জন্য এতটুকু দুঃখ নেই বিশ্বনাথের মনে। কল্যাণীর জন্য মরে যায় নি ও অথবা গৌরীর বেদনায় আহত হয়ে পড়ে নি। ওদের দুজনের মধ্যে ধ্রুবতারা হয়ে জীবনের একটা দিক বুঝতে শিখেছে ও। কল্যাণী মরেছে মরুক। গৌরীর জীবনের পরিণতিও যদি ওই রকম একটা কিছু হতো, তাতেও ওর মনের পর্দা ব্যথার দোলায় দুলে উঠতো না।

কল্যাণীর মৃত্যুর কারণে একটা মাত্র খচ্‌খচানি বিশ্বনাথের মনের মধ্যে বার বার ফুটছে। সে শুধুই একটা অপরাধবোধ। অথচ বিশ্বনাথের মনে হয়েছে কল্যাণীর আত্মহত্যার পশ্চাতে আসলে গৌরী বা বিশ্বনাথ ওদের কেউ দায়ী নয়। এ শুধু অস্বচ্ছল পরিবারের বয়স্ক মেয়ের মৃত্যুমাত্র। তা নইলে ও বয়সে চার পাঁচটি সন্তানের জননী হতে পারতো কল্যাণী। যদি ঠিক সময়ে বিয়ে হতো ওর।

আর গৌরী? না, তাকেও দোষ দেবেনা বিশ্বনাথ। কল্যাণী মরে বেঁচেছে আর গৌরী বেঁচে মরেছে। দুরন্ত বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাই মনের মৃত্যু ডেকে এনেছে ওর।

প্রথম দিকটাতে অতখানি বুঝতে পারে নি বিশ্বনাথ। প্রথম প্রথম যখন এলো ও, খুব সহজভাবেই সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। তারপর একদিন ও বুঝতে পারলো কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে বা ঘটছে।

বিকেলের দিকে প্রায় ওরা বেড়াতো। কোন দিন বিশ্বনাথ একলা, কোনদিন সঙ্গে থাকতো কল্যাণী বা গৌরী। গৌরী একলাও বেরুতো কখনও-সখনও। সেই বেড়ানো, সেই মেলামেশার মধ্যে একটা ইঙ্গিত যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইলো দিনেদিনে। বিশ্বনাথ বুঝলো গৌরী যেন ত্বড়িৎগতিতে এগিয়ে আসছে। মনে পড়লো, এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে গৌরী বুঝি ভালবেসেছে ওকে। কিন্তু কেমন সে ভালবাসা! স্বামীর বর্তমানে স্ত্রী তার বন্ধুর কাছে ধরা দিতে চাইছে, এও একটা কঠিন বিস্ময়।

কি একটা মনোরম যাদু রয়েছে নারীর সান্নিধ্যে। আর সেই জন্যই অবুঝের মত খানিকটা শান্তি কামনা করেছিলো বিশ্বনাথ। কিন্তু পৃথিবীর সব কিছুই শান্তি নয়। শান্তির খোলসের অভ্যন্তরে রয়েছে তীব্র হলাহল। সে হলাহলের সম্ভাবনা ও বুঝবে কেমন করে? জীবনের কোন অভিজ্ঞতার মূল্যে?

সাপটগ্রাম স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে ঠিক সন্ধ্যার মুহূর্তে দাঁড়িয়েছিলো বিশ্বনাথ। গৌরীও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখ ঘুরিয়ে। ফিকে অন্ধকারে পাহাড়ী জঙ্গলের আড়ালে মাত্র ওরা দুটি প্রাণী। চারপাশে জমাটবাঁধা পাহাড়ী নিস্তব্ধতা থমথম করছে।

বিশ্বনাথের মনে হলো গৌরী কাঁদছে। কিন্তু না, গৌরী কাঁদছে না। ও যখন ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথের হাত চেপে ধরে তাকালো, বিশ্বনাথ দেখলো—না, ওর চোখে জলের আভাস নেই। কিন্তু না কাঁদলেও, কাঁপছে গৌরী। ভীরু পাখির মত ধুক্‌পুক্ করে কাঁপছে। ওর হাত ধরে গৌরী বললো—না-না, আমি চাইনা, চাই নি।

ওই কথাটার ইঙ্গিতে কি যে বলতে চায় গৌরী বিশ্বনাথ তা জানতো। জানতো, গৌরী ওর জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা নিয়ে আর চলতে পারছে না। তার ইঙ্গিত অনেক দিন আগে, অনেকবারই দিয়েছে গৌরী। খুলেই বলেছে

ওর জীবনের ব্যর্থতার কথা। কিন্তু সে ব্যর্থতা এতখানি প্রকট তা কল্পনা করেনি বিশ্বনাথ।

কুমারী জীবনের আশা-আকাঙ্খা আর কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য যে কতখানি আজ বুঝতে পারছে গৌরী। তিন তিনটা বৎসরে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে ও। আসাম রেলের পাখির খাঁচার মত স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে ছোট থেকে বড় হয়েছে পর্বতপ্রমাণ কল্পনাকে আশ্রয় করে। আর আজ বিবাহিত জীবনের বন্ধনের মধ্যে ওর কল্পনাপ্রবন মন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরছে। কুরূপ স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে অনেকগুলো দিনরাত্রির মূল্যে নিজের বঞ্চনার কথা জানতে পেরেছে ও।

কথা বলেনি বিশ্বনাথ। ও শুধু দেখলো গৌরীর পদ্মডাগর চোখের কোণে বর্ষণ সম্ভাবনায় এক টুকরো কান্নার মেঘ অপেক্ষা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে পড়লো যমুনার কথা। যমুনা নামে একটি মেয়েকে যেন আবিষ্কার করলো বিশ্বনাথ আর একটি নারীমূর্তির মধ্যে। মনে হলো না-না, ও গৌরী নয়, ও যমুনা। পৃথিবীর সব মেয়েই বুঝি যমুনা। আর সে কথা ভেবে ছলাৎ করে কেঁপে উঠলো বিশ্বনাথের বুক। যমুনা! না, ও গৌরী। দিব্যেন্দুর স্ত্রী গৌরী।

আবার কথা কইলো গৌরী, বললো—আমাকে তুমি বাঁচতে দাও।

কি মনে হলো, বিশ্বনাথ কথা বললো—কী চাও তুমি?

—তোমাকে।

—আমাকে! কিন্তু তা পেয়ে কি খুশি হবে তুমি?

—হবো।

তারপর আরো একটু বাড়াবাড়িই বুঝি করে বসলো ওরা। আর যেটুকু করলো তা এমন কিছু নূতন নয়।

আজ রূপনারায়ণের তীরে এই নির্জন নিঃশব্দের মধ্যে বিমূঢ় হ'য়ে বসে সেই সব কথাগুলো যেন বড় বেশি করে মনে পড়ছে। তোলপাড় করছে মনের কোন এক প্রান্তে। বিশ্বনাথ ভাবলো কতখানি নির্দয় ও হ'তে পেরেছিলো সেদিন। মমতার এতটুকু অণুকণাও যদি থাকতো তা হ'লে গৌরীর বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে এমন করে চলে আসতে পারত না ও। হয়তো বা কল্যাণীও তার কুমারী জীবনের জ্বালা নিয়ে নিজের শাড়ির ফাঁসিতে অমন করে ঝুলে পড়তে পারতো না।

একদিন সকালের দিকে কেন যেন মনটা উদ্বেল হ'য়ে উঠলো বিশ্বনাথের। অথচ কি যে সেই উদ্বেলতার কারণ ও নিজেই বোঝেনি। তবুও মন আর মুখভার করে চুপচাপ বসেছিলো। বসে বসে বুঝি ওর এই আনমনা মনের সূত্রপাত খুঁজছিলো। কিন্তু হিম্‌সিম্ খেয়েও আবিষ্কার করতে পারে নি।

সকালে ঘর গোছাবার কাজ কল্যাণীর। ঘরে ঢুকে একবার কল্যাণী ফিরে তাকিয়েছিলো বিশ্বনাথের দিকে। তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য মেঝের সঙ্গে ওর পাজোড়া আটকে গেলো। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। এগিয়ে গেলো কল্যাণী। বিছানা গুছোতে এসে আরো কয়েকবার ফিরে তাকালো ও। তারপর একসময় অর্ধসমাপ্ত কাজ রেখেই আস্তে এসে দাঁড়ালো বিশ্বনাথের পাশে। খানিকক্ষণ চুপচাপ। একবার মুখতুলে বুঝি বিশ্বনাথ তাকিয়েছিলো কল্যাণীর দিকে। তারপর আবার চুপচাপ।

কল্যাণী বললো—কি হয়েছে তোমার?

—আমার! কেন! কই না?

—হ্যাঁ; লুকোতে যেয়ো না, খুলে বলো আমাকে।

—সত্যিই কিছু হয়নি, বিশ্বাস করো।

তবুও বিশ্বাস করতে মন চায়নি কল্যাণীর। কোনো মেয়েরই বুঝি চায় না। তাই আস্তে করে বিশ্বনাথের কাঁধের ওপোর একটা হাত রেখে কল্যাণী বললো—যদি বিশ্বাস করে থাকো, বলতে পারো নির্ভয়ে।

কথা কইলো না বিশ্বনাথ।

কল্যাণী বললো—সত্যিই তোমার কেউ নেই?

—না।

—মা-বাবা, ভাইবোন, কোন আত্মীয় স্বজন?

—না-না, কেউ নেই।

আর বলতে পারলো না বিশ্বনাথ। পুরোনো কথা মানেই এক একটা জলন্ত অঙ্গার যেন। সে অঙ্গারের স্পর্শে ও জ্বলতে চায় না।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো কল্যাণী। এমন করে চলে যাবে বিশ্বনাথ ও যেন আশা করতে পারে নি। যদি আর কয়েকটা মুহূর্ত থাকতো ও অনায়াসে বিশ্বনাথের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আস্তে করে বলতে পারতো—কী হ'য়েছে তাতে? এইতো আমি রয়েছি। তোমার আমি। কিন্তু সে বলার অবকাশটুকু পেলো না ও। পুরো একটা বৎসর ধরে মনের মধ্যে নিজে

নিজেই কথাটা বলেছে ও, আর তার উত্তরে কতখানি উষ্ণতায় উগ্র উঠবে বিশ্বনাথ তার কল্পনা করেছে।

আর বিশ্বনাথ বাইরে ছুটে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের মনেই ও বলেছে না, কেউ নেই। সব মরেছে। মরে গেছে আমার।

কল্যাণীকে যখন কথাটা বললো ও, বলতে গিয়ে ওর গলাটা যে ধরে আসছিলো না, তা নয়। তবুও অক্লেশেই বলে ফেললো-না, কেউ নেই ওর। সত্যিই তো, কে আছে ওর? পেটের দায়ে মা বিকিয়ে দিয়েছিলেন পরের হাতে। আর ওর বড় মা? হ্যাঁ, তাকেও কেন যেন ভাল লাগেনি ওর। বড় বেশি দয়া, বেশি স্নেহ আর মমতা। দিনরাত শুধু জড়িয়ে রাখতে চায়, বেঁধে রাখতে চায় স্নেহ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। নিবিড় করে বাৎসল্যের বন্ধনের মধ্যে জড়াতে চায়। কিন্তু অত স্নেহ-আদর-মমতা বা বাৎসল্যের ডোরে বাঁধবার চেষ্টা যদি না করতো, তবে হয়তো বিশ্বনাথের জীবনের গতি ফিরতো অন্যদিকে।

দিব্যেন্দুর সংসারে গৌরী আর কল্যাণী দুটো মেয়েপ্রাণকে দেখেছে বিশ্বনাথ। কল্যাণী এ সংসারের একটা বোঝা। অস্বাচ্ছল্যতার মধ্যে একটা ক্ষতির মূর্ত সম্ভাবনা। কিন্তু তবুও মেয়েটার মুখে হাসি। কল্যাণী হাসে। কিন্তু কল্যাণী হাসলেও নিজে বুঝতে পারে না সে হাসির আবরণের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন কান্না লুকিয়ে রয়েছে। ওর হাসি মানেই বয়স্ক মেয়েমনের অপরিপূর্ণতার কান্না।

দিব্যেন্দুর বৃদ্ধা মা, তাঁরও জড়াবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা। ছেলের মতো কাছে বসিয়ে মাথায় হাত বুলোতেন তিনি, বলতেন—আগের জন্মে তুই আমার ছেলে ছিলি বাবা।

এই যে জড়িয়ে পড়া, স্নেহ-মমতার গণ্ডির মধ্যে ধীরে ধীরে একটা বন্ধনকে স্বীকার করে নেওয়া এটাই সহ্য করতে পারে না বিশ্বনাথ। খুব ছোটবেলায় দেখেছে ওর নিজের মা-কে। তারপর যমুনার মা নীরজাসুন্দরীকে। আর দেখেছে ওর বড়মাকে। অত বিষয় সম্পত্তি, অত প্রতাপ যার, তাঁর মধ্যেও মাতৃত্বের চিরন্তন একটা রূপ। যেখানে ধনী নির্ধনের কোন প্রশ্ন নেই। সবাই এক। তাই মনে হয় বিশ্বনাথের, আসলে প্রৌঢ়ত্বের পর থেকেই বুঝি মেয়েরা মনের দিকে বড় কাঙাল হ'য়ে পড়ে। ওঁদের দিন যতই ঘনিয়ে আসে, মৃত্যুর নিকটবর্তী হতে থাকে, তত বেশি ওঁরা জড়াতে চায়। জড়িয়ে বাঁচতে চায়।

আসলে এই যে জড়ানো, জড়িয়ে থাকবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকাকে কেন্দ্র করেই এসব প্রবৃত্তি। ওঁরা মরতে চায় না। মৃত্যুঞ্জয়ী হবার তীব্র বাসনা ওঁদের মধ্যে। কিন্তু তবু ওঁরা জানে মৃত্যু একদিন আসবেই। আর তাই ভেবে সেদিনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যত বেশি জড়িয়ে পড়তে পারে, জড়িয়ে পড়ে। একটা বিশাল ব্যাপ্তির সৃষ্টি করতে চায় ওরা পরিচিত অপরিচিত দলের মধ্যে। আর এটা বোধ হয় শেষ বয়সে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

দিব্যেন্দুকে ও একদিন বললো—আচ্ছা দিবু, কল্যাণীর বিয়ে দিলে পারিস।

হেসে উঠলো দিব্যেন্দু—পাগল!

—কেন!

—তা হয়না।

—কেন হবেনা?

চুপ করে গেলো দিব্যেন্দু। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কি ভাবলো তারপর বললো—অত টাকা পাবো কোথায়?

—কিন্তু তাই বলে মেয়েটা আইবুড়ো থাকবে?

—যার যেমন বরাদ, দিব্যেন্দু বললো, ওর ভাগ্যটাই পোড়া।

আর কোন কথা হয়নি। বিশ্বনাথ লক্ষ্য করেছে কল্যাণীর কথা উঠলেই দিব্যেন্দু কেমন ম্লান হযে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলতে চায়।

আসামের মত জঙ্গলের রাজত্বে সাপটগ্রাম খুব ছোট জায়গা নয়। বাঙ্গালী পরিবারের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য নয়। কল্যাণীর মৃত্যুর পরে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সব আলোচনাই অর্ধপথে থামতে শুনেছে বিশ্বনাথ।

সবটাই যেন রহস্য মনে হয়েছে ওর কাছে। কল্যাণীর আত্মহত্যা, গৌরীর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, সব।

কিন্তু এই সংসারে কল্যাণীর বেঁচে থাকাটাও আর একটা বিস্ময়ের কথাই যেন। ওর মা, গৌরী অথবা দীনেশ ওদের যে ব্যবহার, তাব মধ্যে মুখ গুঁজে কোন ভরসায় যে মেয়েটা বেঁচেছিলো তাই ভেবে অবাক হতো বিশ্বনাথ। দিব্যেন্দুর মা মুখরা। তার কোন কথাই কোন সময়ে বলতে আটকায় না। সে নিজের পেটের মেয়ে কল্যাণীই হোক অথবা ছেলের বউ গৌরীই হোক। কিন্তু ওর মধ্যেও বুক বেঁধে কল্যাণী বেঁচেছিলো এতকাল। বেঁচে আছে গৌরী।

কিন্তু দিবেন্দুকে ও দেখেছে, ভর্ৎসনা দূরে থাক, কোন সময়ে একটা খারাপ কথাও মুখে ফোটে নি ওর। ওই একটি ছেলে, আশ্চর্য মাটি-নরম মন ওর। থেকে থেকে বিশ্বনাথের মনে হতো কি একটা দুর্বোধ্য কান্না রয়েছে দিব্যেন্দুর মধ্যে। সে কান্না কখনও বাইরে প্রকাশিত হয়নি। শুধু মনের মধ্যে কান্না পুষে পুষে স্থির হয়ে রয়েছে দিব্যেন্দু।

দিব্যেন্দুর মনে শান্তি নেই। সুখ নেই। গৌরীর কাছ থেকে ও স্বীকৃতি পায়নি। গৌরী ওকে কিছুই দেয়নি অথচ ওর স্ত্রীর অধিকার নিয়ে দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন কাটাচ্ছে। এক সঙ্গে রয়েছে, থাকছে শুধু একটা ক্ষেত্রে। কোথায় যেন একটা ব্যবধানের পাহাড় আড়াল করে রেখেছে স্বামী-স্ত্রীকে। দিব্যেন্দু সব দিতে চেয়েছে গৌরীকে আর গৌরী সব নিয়ে কিছুই দেয়নি, দিতে পারেনি। গৌরীর মনের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা মেটাতে পারেনি দিব্যেন্দু। সে অসামর্থ্য দিব্যেন্দুর নয়। যাঁরা ভগবদ্‌বিশ্বাসী তাঁরা বলবেন—এ হচ্ছে কপালের লেখা। কিন্তু বিশ্বনাথ ভেবেছে এ একটা মস্তবড় ভুল করছে দিব্যেন্দু। মুদ্রার মূল্য অনুযায়ী যেমন দ্রব্য তেমনি ব্যক্তিত্ব। অবস্থা আর রূপের মূল্য থাকলে তবে রূপবতী স্ত্রী ঘরে আনা উচিত।

দিব্যেন্দুর মন নিয়ে বিচার করে নি ও, দিব্যেন্দু কি চায়। কিন্তু দিব্যেন্দু যদি সহজ হয়ে ওর জীবনের এই ব্যর্থতার কথা বলতো, তাতে হাল্‌কা হতে পারতো খানিকটা। সবটাই তো বুঝতে পেরেছে বিশ্বনাথ, কিন্তু তবুও কোন্ সংশয়ে দিব্যেন্দু সব গোপন করে যাচ্ছে ওর কাছে ?

কিন্তু দোষ দেবার কোন কারণ নেই। অন্ততঃ সেই রকমই মনে হয় বিশ্বনাথের। ওরা যেন সব কটা পুতুল। কোন এক অদৃশ্য সঙ্কেতে ওদের ওঠা বসা। জীবন থেকেও নিষ্প্রাণ, বুদ্ধি থেকেও ওরা একটা ক্ষেত্রে অজ্ঞ। আর সেই অজ্ঞতার জন্যই মানুষ শুধুই কান্নার বোঝা বয়ে মরছে।

সন্ধ্যার দিকে বাইরের ঘরে চুপচাপ বসেছিলো বিশ্বনাথ। দিব্যেন্দু এসে ঢুকলো। কেমন ম্লান ওর মুখখানা। ভেতর বাড়ি থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এলো দিব্যেন্দু, এলো গৌরীর সান্নিধ্য থেকে কিন্তু বিশ্বনাথ ভেবে পেলো না, এর মধ্যেই এমন কি ঘটে গেলো, যার জন্য এতখানি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে দিব্যেন্দু।

দিব্যেন্দু বললো—তুই একটা বিয়ে কর বিশু।

—বিয়ে !

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ ?

—এমনি।

চুপ করে বসে রইলো বিশ্বনাথ। মনেমনে ও ভেবে পেলো না ওই কথার মধ্যে কোন ইঙ্গিত লুকিয়ে রেখেছে দিব্যেন্দু। অনেকক্ষণ পর ও বললো—ঠিক বুঝতে পারছি না, কী বলতে চাস তুই !

—কিছুই না, শুধু বিয়ে।

—কিন্তু কেন ?

—ওই যে বললাম, এমনি।

—না, স্পষ্ট করে বল্।

কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বলেনি দিব্যেন্দু।

প্রথমটা একটু সন্দেহ হয়েছিলো। দিব্যেন্দুর কথা, ওর হাবভাব দেখে সন্দেহটা বদ্ধমূল হলো। ও ভেবেছিলো হয়তো দিব্যেন্দু বাঁধতে চায় বিশ্বনাথকে। তবে কি কল্যাণীর সঙ্গেই বেঁধে ফেলতে চায় নাকি দিব্যেন্দু। সেই রকম সন্দেহই করেছিলো প্রথমটা। কিন্তু সন্দেহটা ভাঙলো ওর খেতে গিয়ে।

খেতে গিয়ে দেখলো সমস্ত বাড়ীটাই কেমন থমথমে। অথচ বাইরের ঘরে কতক্ষণই বা বসেছিলো বিশ্বনাথ। এর মধ্যেই এমন কি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, যার জন্য এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন গাম্ভীর্য নামতে পেরেছে সকলের মধ্যে ? সকলেই নীরব। আর তার মধ্যে কোন প্রাণে কথা বলবে বিশ্বনাথ ? তবুও হয়তো চেষ্টা করতো কিন্তু হঠাৎ অস্ফুচ্ছ একটা ভগ্ন কণ্ঠস্বর কান্নার সুর ওর কানের পর্দায় এসে দোলা দিয়ে গেলো। তারপর আর কথা বলবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

কিছু বুঝতে পারেনি, জানতেও পারেনি। শুধু রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে বিশ্বনাথের মনে হলো, তবে কি অন্য কোন রকম ঘটনা কিছু ঘটে গিয়েছে নাকি। দিব্যেন্দুর ওই বিয়ের প্রস্তাবের পশ্চাতে কোন রহস্য খেলা করছে ? বিশ্বনাথের মনে হলো হয়তো ওরা বুঝতে পেরেছে। স্বামী হয়ে দিব্যেন্দু না পারুক, পেরেছে ওর মা অথবা কল্যাণীই কিছু ফাঁস করে দিয়ে থাকবে। আর সেই জন্যই হয়তো দিব্যেন্দু ওর স্ত্রীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কল্যাণীকে বেঁধে দিতে চাইছে বিশ্বনাথের সঙ্গে। তাই যদি হয় ! বিশ্বনাথের মনের মধ্যে কেমন

একটা অস্থিরতা দ্রুতভাবে চন্‌মন্ করে উঠলো। কিন্তু তাই যদি হয়, কী বলবে ও! কোন কথা দিয়ে এমন সব মনগড়া ঘটনাকে ধূলিসাৎ করে দেবে? গৌরী তার জীবনের ব্যর্থতার মূল্য দিয়ে পেতে চাইছে বিশ্বনাথকে। আর বিশ্বনাথ? হ্যাঁ, কোন যাদুর মোহন টানে সেও এগুচ্ছিলো কানা পথিকের মত কোন দিক্‌বিদিক্ না জেনে।

সেই রাত্রিতেই মনস্থির করে ফেললো বিশ্বনাথ। না, আর জড়িয়ে পড়বে না ও। কোন বন্ধনই শান্তি দিতে পারেনি ওকে। যে যত টানতে চেয়েছে তত দূরে যাওয়ার একটা মন এই ক-বৎসরে ওর মনে রৌদ্রছায়ার মত খেলা করছে। আবার ওকে পথে নামতে হবে, এগুতে হবে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথে।

পরদিনই ও দিব্যেন্দুকে বললো। বললো—দিবু, আমাকে ছেড়ে দে।

—ছেড়ে দেবো। অবাক হলো দিব্যেন্দু, মানে!

—আমি চলে যাবো।

—সেকি রে!

—হঁ্যা।

থমকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো দিব্যেন্দু। তারপর বললো—তুই কি ভেবেছিস জানি না বিশু, তবে তুই চলে যাওয়া মানেই ··মানেই—অর্ধপথে কথাটা শেষ করলো দিবেন্দু, বাকিটা বলতে না পেরে।

—মানেই? মুখ তুলে দিব্যেন্দুর চোখে তাকালো বিশ্বনাথ।

কিন্তু আর কিছু বলতে পারেনি দিব্যেন্দু অনেকক্ষণ। তারপর যখন কথা বললো ও, বললো—তার চেয়ে কদিন ঘুরে আয়।

কী একটা বেদনায় বিশ্বনাথও পীড়িত হলো। যাওয়া হলো না ওর।

কিন্তু কল্যাণীর আত্মহত্যার পর আবার উদ্বেল হয়ে উঠলো বিশ্বনাথের মন। এইবার, এইবার ও চলে যাবে। তারপর অনেক ভেবে দেখলো তখনই, কল্যাণীর মৃত্যুর পর এত তাড়াতাড়ি সরে পড়া ঠিক হবে না ওর পক্ষে।

দুটো মাস ঘুরলো আবার। অস্থির হয়ে উঠলো বিশ্বনাথ। ও ভেবেছিলো শুধু দিব্যেন্দুকেই বলবে কিন্তু দিব্যেন্দুর কান থেকে এমন করে যে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে পারে আগে ভাবে নি।

আপত্তি করে নি দিব্যেন্দু। সে ভেবেছিলো আবার ঘুরে আসবে বিশ্বনাথ।

অনেকদিন বাইরে যায়নি। যাক, ঘুরে আসুক। তাই ব্যবসায়ের হিসাব-কিতাবের প্রশ্ন ওঠেনি। মূলধন বাদে লাভের কড়ির মোটা টাকাটাই তখন বিশ্বনাথের হাতে।

চলে আসবার ঠিক আগের দিন সুযোগপ্রত্যাশী গৌরী এলো হঠাৎ, বললো —চলে যাচ্ছ ?

—না !

—হ্যাঁ, সব শুনেছি আমি।

—কী শুনেছ ?

—বেড়াতে যাচ্ছ।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তুমি ফিরে আসবে এ বিশ্বাসও কি করতে বলো আমাকে ?

—নিশ্চয়ই।

—করবো, আস্তে করে বললো গৌরী, তাই করবো, যদিও জানি এ বিশ্বাস আমার ভুল।

সেই নির্জনতার সুযোগে আরও একটু কাছে সরে এসে গৌরী ঘন হয়ে বসেছিলো। আস্তে করে বলেছিলো—আমার কি এমন কিছুই নেই যা দিয়ে তোমার পথরোধ করতে পারি ?

ঠিক তেমনি আস্তে করেই বললো বিশ্বনাথ—সব আছে। তোমার আলোই আমাকে টেনে আনবে গৌরী।

রূপনারায়ণ ঠিক গর্জন মুখরিত না। ও যেন অচপল শান্ত একটি মেয়ে। ঠিক যেন কল্যাণী ও। রাত্রির নিস্তব্ধতায় ওর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আকুল কান্নার রেশ ছড়িয়ে এগিয়ে চলেছে রূপনারায়ণ। না, ও ফিরবে না। সমুদ্রের ডাক ওকে উন্মাদ করেছে। আর সেই কান্নার উপকূলে বসে নিজের কান্নার বেগ রুখতে চাইছে বিশ্বনাথ। কিন্তু যতবার রুখতে চাইছে ততবার ওর মন অসহায় বেদনায় আহতের মত ছটফট করছে। তবুও ওর মনে সেই এক প্রশ্ন, মণিকা কি তা হলে আর কোনওদিনও ফিরে আসবে না ওর কাছে ?

ছয়

আজ, ঠিক এই মুহূর্তে মনে হ'চ্ছে—না, মণিকাকে ও নিয়ে আসেনি বরং মণিকাই ওকে নিয়ে এসেছিল। পথ দেখিয়েছিল। আর সেই পরমপ্রিয় মণিকাই আবার অক্লেশে চলে যেতে পারল, অতি সহজেই ছিন্ন করতে পারল নিবিড় বন্ধনের ডোর। কিন্তু এমন করে যে মণিকা ছেড়ে যেতে পারবে, অনায়াসে ফাঁকি দিতে পারবে সেকথা একটি মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেনি বিশ্বনাথ। অন্ততঃ এই কটা মাসের প্রতিটি দিনরাত্রির উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে— এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশ্বাস করতে ওর মনের কোথাও যেন বেদনার আচড় লাগছে। এই যে আজ ও পথের ভিখিরির সমান হ'য়ে পড়েছে কিন্তু তবুও সেই দুঃসহ ঘটনার স্মৃতিটুকু মনের পর্দায় টেনে এনে, অবিশ্বাসের গভীর মধ্যে মণিকাকে বন্দী করে কিছুতেই ওকে ছোট করতে পারছে না।

অনেক রাত পর্যন্ত রূপনারায়ণের কান্না শুনল বিশ্বনাথ। শুনতে শুনতে মনে হ'ল জোয়ার ভাঁটার খরস্রোত যেন ওকে বিদ্রূপ করছে। ওর রক্তের অণুতে অণুতে দপ্‌দপ্‌ করে উঠল অব্যক্ত জ্বালার বহ্নি। উঠে দাঁড়াল বিশ্বনাথ। বাহিরে ম্লান অন্ধকারের মধ্যে রূপনারায়ণের তীর ধরে এগিয়ে চলল। আবার চলা সুরু হ'ল ওর।

মণিকাকে বিশ্বাস করে ওর জীবনের প্রায় সবটুকুই বলেছিল বিশ্বনাথ। সব কথা শুনে খুব ঘন হয়ে এসেছিল মণিকা, আলগোছে বিশ্বনাথের বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে, অনেকক্ষণ মুখ তুলে তাকিয়েছিল তারপর বলেছিল – না, তোমার চলা এখানেই শেষ। আর পাখির মত উড়তে দেব না তোমায়। আর যদি যাও তাহ'লে একলা নয়। যেখানে তুমি সেখানেই আমি।

কিন্তু সে যে কতবড় মিথ্যা, কত বড় প্রবঞ্চনা –আজ এই রাত্রির নিঃসীম প্রান্তরে চলতে চলতে সেই কথাই ভাবছিল বিশ্বনাথ। নিজের মনে ও বলল– এত বড় ফাঁকি তুমি কেমন করে আমায় দিলে ?

আজ ও শূন্য, রিক্ত। যে দামী চামড়ার স্যুটকেশে মোটা টাকার অঙ্ক নিয়ে পথে বেরিয়েছিল আজ তার কিছুই নেই। কিছুই নেই ওর সঙ্গে।

স্বেচ্ছায় সবকিছু ফেলে চলে এসেছে। আজ আর কোন মোহ নেই বিশ্বনাথের। ও এখন একা। একান্ত একাকী। কিন্তু এই নিঃসীম অন্ধকারে নগ্নপদে রূপনারায়ণের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে আজ একটিমাত্র মেয়ের কথাই বার বার মনে পড়ছে। না, কল্যাণী নয়, গৌরী নয়, আর মণিকা তো নয়-ই। সে যমুনা। যমুনার কথাই বার বার মনে পড়ছে। মনে হ'চ্ছে জোয়ার-ফাঁপা রূপনারায়ণের গভীর থেকে যেন ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে যমুনা।

যমুনার কথা ভাবতে ভাবতে এক এক করে এই কিছুক্ষণ আগের ইতিহাসটুকু পর্যন্ত স্মরণে মৃদু তরঙ্গের মত দুলে দুলে উঠছে। ওর মনে হচ্ছে এই কি জীবন? কিন্তু আমি এবং আমার জীবন এই যে কথাটা, যা মানুষ ভাবতে ভালবাসে, ভাবতে উৎসাহিত হয়—এর কোন একটা অর্থই যেন সত্যিকারের সার্থক মনে হচ্ছে না বিশ্বনাথের কাছে।

আমি কি আত্মহত্যা করব? অন্ধকারের মধ্যে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করল বিশ্বনাথ। ডুবে মরব এই জোয়ারের জলে? মরতেও তো পারি আমি। মরলে সব জ্বালা জুড়ায়। একদিন এই বঞ্চনার জ্বালা, বাসনার কান্না নিয়ে অনায়াসে গলায় দড়ি দিয়েছিল কল্যাণী। আজ মণিকাও গেল। চিরকালের মত হারিয়ে গেল, খসে গেল বৃন্তচ্যুত পত্রের মত। তারপর আর আমার রইল কী? কিছুই নেই। তবে? তবে আমি কি সন্ন্যাসী? রিক্ত, নিঃস্ব, সংসারত্যাগী সাধু?

কঠিন অন্ধকারে একটা উঁচু ঢিপিতে পা আটকে হঠাৎ পড়ে গেল বিশ্বনাথ। মনে হ'ল ও পড়ে গেল কোন্ জলধির অতলে। ও ডুবছে, ডুবে যাচ্ছে।

—বাবা! অস্ফুটে কাতরোক্তি করল বিশ্বনাথ। নেশাগ্রস্ত মাতালের মত টাল সামলে উঠে পড়ল। এতক্ষণে মনে পড়ল, নুতুন করে নিজেকে চিনল যেন। আর একটা বিশ্বনাথ যেন বলল—না-না, মরতে আমি আসিনি, মরব না।

যখন ছোট ছিল, ওর মা-কে কাঁদতে দেখেছে বিশ্বনাথ। শুনেছে—মা একই কথা বলেছে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার স্বরে ভিজিয়ে যে—বাবা চলে গেছেন, সন্ন্যাসী হ'য়ে চলে গেছেন হিমালয় পর্বতে।

বাবার স্মৃতিটা আজ অনেক ফিকে। কিন্তু ওই একটিমাত্র মানুষের জন্যই

মনটা হু হু করে কেঁদে উঠতে চায়। কোনদিন যদি দেখা হয় তার সঙ্গে তবে সকলের আগে একটামাত্র কথাই জিজ্ঞাসা করবে ও, বলবে—কী পেয়েছ? কী পেলে তুমি সব হারিয়ে?

অনেক সময় বিশ্বনাথ ভাবতো, মনে হতো ওর বাবাই যদি আজ সংসারে থাকতেন গৃহী হ'য়ে তা হ'লে হয়তো এমন ক'রে চলে আসতে পারত না ও। আজ মনে হয় ওই একটিমাত্র মানুষই বুঝি ছিল যাকে সত্যিকারের আপন বলা যেতে পারে।

মা-র সেই ভগ্ন কণ্ঠের কান্নার স্মৃতি মাঝে মাঝে বিশ্বনাথের মনকে বড় উৎপীড়ন করে, যখনই ও ভাবতে যায় বাবার কথা। সেই আকুলিত কান্না মনের মধ্যে ছড়িয়ে আর একটি দুর্বার কান্নার সৃষ্টি করতে চায়। ছোটবেলায় তন্ময় হ'য়ে বসে যখন বাবাকে পূজো করতে দেখতো, অথবা ধ্যান করতে— কঠিন বিস্ময়ে বোবার মত হয়ে যেত বিশ্বনাথ। তখন সব কিছুই কাঁচা মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মত মনে হতো। সেই একটা আশ্চয রূপ, একটা বিস্ময়জনিত দিক ও দেখেছে। সে রূপে বাবা বুঝি মহাপুরুষ। কিন্তু আরও একটা রূপ দেখেছে বিশ্বনাথ। সাধনা করতে বসে যত কঠিন দেখাতো বাবাকে, ঠিক তার বিপরীত দিব্যরূপও ও দেখতে পেয়েছে। যখন ভূত-ভবিষ্যত জানতে এসেছে কেউ অথবা তন্ত্রের বলে দুঃসময় লঙ্ঘন করতে এসেছে। সেখানে বাবা করুণায় সকরুণ।

আজ মনে নেই কোথায় তাঁকে দেখেছিল বিশ্বনাথ এবং কতকাল আগে। কোন পথে কোথায় যে দেখা হয়েছিল সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে, সে স্মৃতিটুকু আজ গ্লানিমার অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। বাবা সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে—এই যে কথাটা, সেই কথাই—সন্ন্যাসীদের প্রতি কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল ওর মনে। দারুণ শীতেও তাই এক সন্ন্যাসীর জলন্ত চুল্লীর পাশে গিয়ে ও বসেছিল। সেই সন্ন্যাসীই বলেছিল ওকে, বলেছিলো— মায়ি দর্শন করো বেটা, সব পাপ-তাপ পাণী হো জায়েগী।

আসাম থেকে বেরিয়ে অনেক দেশ ঘুরেফিরে অবশেষে ও এল কালীঘাটে। কালীঘাটের মন্দিরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই কথাই মনে পড়েছিল।

সেই এক বিচিত্র জীবন সুরু হ'ল ওর।

আশ্চর্যভাবে ভাব হয়ে গেলো ডালার দোকানের মালিক দীননাথের সঙ্গে। মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে ভাব গভীর হলো। তখনও চৌদ্দ পয়সার হোটেলের খাবার আর যাত্রী নিবাসের সঙ্গে চুক্তিটুকু সম্বল।

দীননাথ বললো—অমনি ক'রে তুমি পথে দাঁড়াবে ভাই। দু-চার পয়সা আছে, সব খুইয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। তার চেয়ে একটা কিছু কর।

কিছু টাকা তখনও ছিল সঙ্গে। কিন্তু তা দিয়ে কি যে করবে ও, কী করলে পথে দাঁড়াতে হবে না, সে পথ ওর জানা ছিল না। দীননাথ বললো—ছোট দেখে একটা খেলনা-পুতুল আর চুড়ি-সিঁদুরের দোকান ফেঁদে বসো, ভাগ্যে থাকলে ওতেই লাখ।

ঘর ভাড়া থেকে সুরু করে দীননাথই সব করে দিয়েছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে থেকে যতটা দেখে-শুনে জানতে পারা যায়—সেইটুকুই জেনেছিল বিশ্বনাথ।

সেই এক জীবন। সেই ভোর পাঁচটায় উঠে গঙ্গায় স্নান সেরে এসে চা-জলখাবার খেয়ে দোকান খোলা। সারাদিন এই-ই চলল এক নাগাড়ে।

কালীঘাটের এই অচেনা রাজত্বে দীননাথই ছিল একমাত্র সুহৃদ, একমাত্র আপন। দোকানটা ওর অনেক কালের। বাপের আমলের। উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের মৃত্যুর পর দোকান পেয়ে এখন নিজেই চালাচ্ছে। বেশ বড়সড ডালির দোকান। কয়েক রকমের শুকনো শুকনো মিষ্টি, ফলমূল, কিছু ফুল বেলপাতা আর কমিশনে ঠিক করা জন কয়েক বামুন নিয়ে ওর ব্যবসা। আর যাই হোক দীননাথের হৃদয় আছে। নিজের কাজ দিয়ে তো বটেই তা ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে সে প্রমাণ পেয়েছে বিশ্বনাথ। দীননাথ মায়ের পূজার ডালা বিক্রি করতো বটে কিন্তু ধর্ম বলে কোন দুর্বলতা কোনদিনই প্রশ্রয় পায়নি ওর মনে। ও সব কথা উঠলেই দাঁত বের ক'রে হাসতো দীননাথ, বলতো—দেখ বিশে, ধর্ম-টর্ম ওসব কিছু নয় বুঝলি? আসলে সব ফাঁকি। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে দোকান করছি এই কালীঘাটে। কত শালার নাপিত চাড়ালকে পৈতে লাগিয়ে বামুন ক'রে ছাড়লাম এই খানে—তার আবার ধর্ম। হুঁঃ।

—তুই পাপী, ঘোর পাপী, বলল বিশ্বনাথ। নাপিত-চাড়ালকে পৈতে লাগিয়ে বামুন বানিয়ে পাপের ভাগী হয়েছিস।

- রাখ রাখ, দীননাথের কুৎকুতে চোখ দুটোতে ধক্‌ধক্ করত আগুন। পেটে খেতে না পারলে আবার ধর্ম। হ্যাঁ, ধর্ম যদি বলতে হয় তো মানুষের উপকার কর। পাপ করিনি বুঝলি? যারা খেতে না পেয়ে এসেছে—বুদ্ধি দিয়ে তাদের পেটের ভাত জোগাবার ব্যবস্থা করেছি। পাপ নয়, এই হ'ল গিয়ে আসল পুণ্য। গুলি মার তোর কালি-ফালির।

কিন্তু দীননাথের বন্ধুত্ব তার সহযোগিতা—সব থাকা সত্ত্বেও বছর দুয়েকের মাথায় বিশ্বনাথের দোকানের অবস্থা পড়ে এলো। বছর খানেক মন দিয়ে ব্যবসাপাতি করেছিল, মাল তুলেছিল চারগুণ আর নগদেও বেশ কিছু জমেছিল কিন্তু কী রোগে যে পেয়ে বসল ও নিজেই বুঝতো না। বুঝতে পারলে অন্ততঃ মন উড়ু উড়ু করতো না। কিন্তু সত্যিই বিশ্বনাথের মনের সেই সঙ্গোপন পাখা হাওয়ায় ভর করতে চাইছে। আবার উড়াল দেবার তীব্র নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে।

তবে ওকে কি কেউ ধরে রাখতে পারবে না? কালীঘাটের আশেপাশে বারাঙ্গনাদের রূপ যৌবন অথবা দীননাথ? কিন্তু পারেনি শেষ পর্যন্ত। তা নইলে দীননাথ চেষ্টার কসুর করেনি। অনেক লোভ, অনেক মোহ দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছে। কালীঘাটের এই যে বিচিত্র মোহজাল, কত রূপ আর রঙ-রস তাও শেষকালে বাঁধতে পারলো না বিশ্বনাথকে। দোকানে বসে ও শুধু তন্ময় হ'য়ে ডুবে থাকত কি এক চিন্তায়। যে যাযাবর মোহ ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে দেশ-দেশান্তরে, যে অস্থির চিন্তায় বিন্দুমাত্র স্থিতির ইঙ্গিত ছিল না—তা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আর বিশ্বনাথের চোখে নতুন করে হেসে উঠল সমস্ত পৃথিবী। নতুন মোহে নেশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ল ও। না শুধু মোহই নয় বরং তৃষ্ণা। রক্তের অণুতে অণুতে সেই তৃষ্ণা দুর্বার হ'য়ে ওকে পীড়ন করতে লাগল কি এক দুঃসহ জ্বালায়।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছিল বিশ্বনাথ। তাড়াহুড়ো করে নামাচ্ছিল দোকানের ঝাপ। ঠিক তখনই দীনু এসে দাঁড়াল পেছনে, বলল -এত তাড়া হুড়ো করছিস যে?

না।

হু বাবা, ধুলো দিতে চাস আমার চোখে।

না না, ভাবছিলাম একবার বড়বাজারে যাব।

রেখে দে তোর বড়বাজার আর ছোটবাজার। তার চাইতে চল।

কোথায়?

মুখে কোন কথা বলল না দীননাথ, শুধু একটা চোখ বন্ধ করে আর একটা চোখে বিচিত্র ইশারা করল।

বুঝতে অবশ্য দেরী হলো না বিশ্বনাথের। ও জানে কোথায় যেতে বলছে দীনু কিন্তু তবুও দীনুকে কি করে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়া যায় সেই বুদ্ধিই

আঁটছিলো মনে মনে। কালীঘাট মন্দিরের এই এলাকায় বড বেশি প্রতিপত্তি দীনুর। রাস্তার দাঁড়ান শিকারী বামুন থেকে দোকানদার, কর্মচারী এবং রকবাজ ছেলের দল মায় খারাপ পাড়ার মেয়েমানুষরা পর্যন্ত ওর দাপটে কাঁপে। আজও সেখানেই নিয়ে যেতে চাইছে দীনু। নিয়ে যেতে চাইছে সেই অন্ধগলির সাজানো রূপের বাজারে। কিন্তু বিশ্বনাথের মন টানছে না। কিছুতেই টানছে না। হৃদয় মনের তীব্র কামনার বহ্নিকে নিভিয়ে ফেলবার প্রয়াসে একদিন ও গিয়েছিল দীনুর সঙ্গে।

কালীঘাট রোড ধরে এগিয়ে এসে ডান দিকের একটা অন্ধকার গলিতে ওকে নিয়ে ঢুকলো দীনু, বললো—আগে দেখে নিবি সব কটাকে। মনে ধরলে বলবি। না হলে ও পাড়ায় চলে যাব।

সারিবাঁধা মেয়েগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। কেউ কেউ এগিয়ে এল, এসে সুর্মাটানা চোখে ঝিলিক দেবার চেষ্টা করলো। কে যেন পাশ থেকে বললো—দাদা আজ নতুন খদ্দের এনেছে গো।

একটা পাক খেতে খেতেই মনের ভেতর কী একটা অস্বস্তি ছলবলিয়ে উঠলো। আর দাঁড়াল না বিশ্বনাথ। হনহন্ করে সেই অন্ধগলির সীমানা পেরিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো।

ফিরে আসতে আসতে বিশ্বনাথের মনে হচ্ছিল—মেয়েদের এই এক রূপ দেখল ও। কত করুণ, কত কাঙাল, কত অসহায় ওরা। কিন্তু ওদের এই যে রূপ, যা আজ প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেলো ও দেখে দেখে ভাবলো—ওরা রূপপোজীবিনী, পসারিনী। মানুষকে আকর্ষণ করবার কত ছল চাতুরী ওদের কিন্তু তা শুধুই বেঁচে থাকবার জন্য। মনের জন্য নয়, তৃপ্তিলাভের আশায় নয় শুধু চোখবুজে দাঁতে দাঁত চেপে ওরা ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাস অম্লান বদনে সইবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে কি ভাগ্যের প্রশ্নটাই আসল? এর পশ্চাতে কি ওদের ব্যক্তিগত বাসনা কামনার কোন প্রশ্ন নেই, তাগিদ নেই?

একথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ ছলাৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। মনে পড়ল হ্যাঁ, বাসনা-কামনার প্রশ্নে অনায়াসে ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। গৌরীর কথা মনে পড়ল তখনই। বঞ্চনার যে বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে একটা মাত্র বিন্দুর সম্ভাবনায় মেয়েটা ধুকপুক্ করছে, তার পরিণতি যেন আজ এই মুহূর্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো ওর চোখের পর্দায়।

হ্যাঁ, গৌরীও হয়তো দিব্যেন্দুর ঘরে বন্দিনী হয়ে থাকতে পারবে না। একদিন ও সরে পড়বে। কাউকে সঙ্গী পায় ভাল, না হলে ও একলাই চলে যাবে বাপের কাছে। সেখানে দিনেদিনে নিজেকে নিঃশেষ করবে অথবা সেখান থেকেও সরে এসে ভাসতে ভাসতে হয়তো এমনি এক জায়গাতে উঠবে। তারপর দিনে দিনে ওই দুরাচারী মনটাই মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাবে মেয়েটাকে। কন্তু একটা বিরাট প্রশ্ন মনে হলো তখন। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে মরণের দিকে। কেউ ধীরে, কেউ বা তড়িৎ-গতিতে। কিন্তু কেউ কি বুঝতে পারছে সে কথা। হয়তো বরতে পারে সকলেই, জানে মৃত্যুই জীবনের পরিণতি। আর সেই শেষ দিনটির পূর্ব পর্যন্তই সব কিছু আশা-ভরসা-সংগ্রাম। না, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য নয়, যতক্ষণ বেঁচে আছি সুখের মুখ দেখবো, হাসবো, আনন্দ করবো। এর জন্যই কীট পতঙ্গ থেকে সুরু করে মানুষ পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত। যত দিন ঘনিয়ে আসছে তত আঁকড়ে জড়িয়ে থাকতে চাইছে মানুষ।

কিছুদিন থেকেই আশ্চর্য একটা মাদকতায় নিজেকে নেশাগ্রস্তের মত মনে হয়েছে বিশ্বনাথের। কি ঔদাসীন্য ওকে আঁকড়ে ধরে পাথর করে দিতে চাইছিল। কিছুই ভালো লাগছিল না। শুধু মনটা থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠছিল যেন কার জন্যে।

– কী হলো তোর? বলল দীননাথ।

–কিছু না।

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। জোর করলো দীননাথ।

—বলছি তো কিছুই হয়নি আমার, বিরক্তি ছড়িয়ে বলল বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথের ব্যবহারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দীননাথ আর সঙ্গে সঙ্গে হন হন্ করে বেরিয়ে গেল বিশ্বনাথ।

খিদিরপুরের ব্রিজ ছাড়িয়ে বাঁ দিকের পথে নেমে ওরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল গঙ্গার পারে। মণিকা বলল—এত দেরি হল আপনার?

—হাঁা, একটু আটকে গিয়েছিলাম, চলতে চলতে বলল বিশ্বনাথ। খানিক এগিয়ে বলল—এখানেই বসা যাক, আসুন।

খানিকটা নির্জন এ জায়গাটা। লোকজন নেই এমন কথা নয়, আছে। তবে বেশ দূরে দূরে। ওরা এসে ঢালু গঙ্গার পারে পাশাপাশি বসল।

প্রেতদেহের মত কতগুলো জাহাজ ইতস্ততঃ নোঙর করা রয়েছে গঙ্গায়

জলে। দীপাবলীর অলোক মালার মত কিছু কিছু আলোকরশ্মিও যেন থরে-থরে সাজানো। অস্বচ্ছ আলোর মধ্যে ঘন সান্নিধ্যে বসেছে বিশ্বনাথ আর মণিকা। ফুরফুরে হাওয়ার দাপট এসে আছড়ে পড়ছে ওদের গায়ে-গতরে। মণিকার মাথার চুল উড়ছে, অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে ওর শাড়ির আঁচল আর এপ্রান্ত ওপ্রান্ত। জোর বাতাসে শাড়িটা লেপটে যাচ্ছে মণিকার দেহে। ঘাড় না ফিরিয়েও তেরছা চোখে দেখল বিশ্বনাথ। দেখলো লেপটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মণিকার দেহের নরম জায়গাগুলো যেন স্পষ্ট হতে চাইছে।

মনের মধ্যে পুষে রাখা একটা ভীরু সাপ যেন হঠাৎ কিলবিলিয়ে উঠল বিশ্বনাথের দেহে। কেমন একটা দুঃসহ আবেগে জ্বলে উঠতে চাইল শিরাগুলো। একটু পরে আরও একটু সরে যাওয়ার চেষ্টা করে বলল—চমৎকার জায়গাটা, না ?

—হুঁ, আস্তে উত্তর দিল মণিকা।

তারপর খানিক নিঃশব্দ, চুপচাপ। এলোপাথারি মনের আনাচ-কানাচ খুঁজেও যেন কথার সূত্র পাচ্ছিল না বিশ্বনাথ। কিন্তু তাই বলে এসব পরিবেশে, এমন একটা রমণীয় মুহূর্তে কিছুতেই যেন চুপ করে থাকতে পারছিল না। এবার মুখোমুখি তাকিয়ে বিশ্বনাথ বললো - আপনাব স্বামী কিছু বলবে না ?

—বলুক, জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল মণিকা, বললো—এবপর নিশ্চয়ই আর বিশ্বাস করবেন না—ও আমাকে ভালবাসে।

—বাসে না ?

ম্লান একটু হাসলো মণিকা, বললো—সেতো বুঝতেই পারছেন আপনি। জেনেই যখন ফেলেছেন তখন আর লুকিয়ে লাভ কি ? কিন্তু ওকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। মণিকা থেমে গেলো। মনে হচ্ছিলো ওর গলাটা ভারী হয়ে এসেছে। এ কথা বলতে যেন হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে যাচ্ছে ওর।—হ্যাঁ বিশ্বাস করেছিলাম বলেই এই শাস্তি আমার।

এই ক-টি কথার মধ্যেই মণিকার আসল রূপটা যেন প্রকট হয়ে উঠলো বিশ্বনাথের কাছে। একটা সন্দেহের সূত্র কিলবিলিয়ে উঠলো মনের মধ্যে। সম্ভবত মণিকা আর তার স্বামীর মধ্যে যে সম্পর্ক তার ভিত্ খুব আলগা। ঝুরঝুরে দোআঁশলা মাটির ভিতের মত। ভাবতে গিয়ে মনে মনে খানিক বল পেলো ও। তাকালো মণিকার চোখে। এ যেন ওর চোখ নয়, কোন

খরধার কৃপাণের অগ্রভাগে চকচকে ধ্বংসের ইঙ্গিত। মণিকা নামে একটি নিথর নারীমূর্তি নিষ্প্রাণ জড়ের মত বসে রয়েছে ওর পাশে। যেন একটা মূর্তিই শুধু। আর সে কথা ভেবে বুকের কোন অদৃশ্য অতলে আগুনের শিখার লকলক তপ্ত স্পর্শ অনুভব করল বিশ্বনাথ। সাহসে ভর করে আস্তে এগিয়ে দিল নিজের হাতটা। এগিয়ে দিয়ে মণিকার একটা হাত তুলে নিল ও।

বিশ্বনাথের হাতের মুঠোর মধ্যে মণিকার হাতটা ভীরু পাখির মত কাঁপছিল। ডাগর চোখের ভাসা ভাসা দৃষ্টি তুলে মোহগ্রস্তের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল মণিকা।

ততক্ষণে মণিকাকে একেবারে কাছে টেনে এনেছে বিশ্বনাথ। ওর নিজের বুক, দেহ, হাত যেমন কাঁপছে, ঠিক তেমনি করে অথবা তার চেয়েও দ্রুততালে বুঝি কাঁপছিলো মণিকা। মুখটা নামিয়ে আনতে গিয়ে বাধা পেল বিশ্বনাথ। অস্পষ্ট কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো মণিকা — না—না না।

আশ্চর্য একটা আবেগে থরথর করে কাঁপছিলো বিশ্বনাথ। দেহে মনে আর রক্তের কণিকায় কণিকায় দুর্বার বন্দের ইঙ্গিত ফুসে ফুসে উঠছিলো। মণিকাকে বুকের কাছে অনায়াসে টেনে এনে ফিসফিস করে ও বলল আজকের মত অন্ততঃ এ ভুলটা তুমি আমায় করতে দাও।

মণিকা কথা বলে নি।

কখন যেন আলগোছে মণিকা ওর মুখটা লুকিয়েছিলো বিশ্বনাথের বুকে। লুকিয়ে আর তুলল না। ততক্ষণে মানসিক অনুশোচনায় বুঝি নিস্তেজ হয়ে এসেছিলো বিশ্বনাথের দেহমন, আলগা হয়ে এসেছিল ওর দৃঢ় বাহু বেষ্টনী। কিন্তু তবুও মুখ তুলল না মণিকা।

ঠিক তেমনি অবস্থাতেই অনেকগুলো মন্থর মুহূর্ত পার হয়ে গেলো। এবার ডাকলো বিশ্বনাথ আস্তে করে নাম ধরে ডাকল মণিকার। আর তার উত্তরে এমন করে সাড়া দিল মণিকা, যেন সে অনেক দূর থেকে কথা কইল। বিশ্বনাথের দু কাঁধের ওপোর দুটো হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে মুখটা বিশ্বনাথের চিবুকের কাছে আনলো মণিকা, বলল এরপর কিছুই আর লুকোবার নেই তোমার কাছে।

সাত

বিশ্বনাথের চুড়ির দোকানের খদ্দের মণিকা চক্রবর্তি কেমন করে যেন দিনে দিনে ওর মনের মধ্যে ঝড় তুলল। আর সেই মানসিক ঝঞ্ঝার নিদারুণ পীড়নে দিনে দিনে ওই একটিমাত্র মেয়ে কোথায় যেন টেনে নিয়ে চলল বিশ্বনাথের বিহঙ্গচঞ্চল মনকে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের মোদো মস্তান গোপাল চক্রবর্তির সহধর্মিনী মণিকাকে নিরঙ্কুশ তৃপ্তির আওতার মধ্যে পেয়েছে বিশ্বনাথ। পেয়ে অতীতের সবটুকু স্মৃতির পটে কালির তুলি বুলিয়ে দিয়েছে।

দোষটা ভগবানের কিনা বলা যায় না, কিন্তু চালতাবাগানের ঝুপসী বস্তীর কোন এক ছাদফুটো দেওয়াল-ধ্বসা ঘরে জন্ম হয়েছিল মণিকার। শুধু মণিকাই নয়, ট্রাম কণ্ডাক্টর তিনকড়ি বিশ্বাসের সেই ঘরে মণিকা ছাড়া আরও দুটো ভাগ্য বিপর্যিত কন্যার জন্ম হয়েছিল।

মণিকার বারো বৎসর বয়সের সময় মা নিস্তার পেয়েছিলেন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। তিনকড়ি বিশ্বাসের সংসারে একপেট আধপেট খেয়ে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জন্য শেষকালে পোড়া ক্ষয়রোগে তাঁর গতি হয়েছিলো। সেই বারো বৎসর বয়স থেকেই মায়ের পোড়া ভাগ্য পেয়ে বসলো মণিকাকে। দিন গেলে কোনদিন জুটতো, কোনদিন তাও নয়। কী করে জুটবে? যে সংসারের একমাত্র উপায়ক্ষম ব্যক্তি মদে আর খারাপ পাড়ার নেশায় আয়ের মোটা অংশ ব্যয় করে, তার ঘরে কি সুখ আসে, না শান্তি আসে? কিন্তু আধপেটা খেয়ে, হপ্তায় দু-চারদিন উপবাসে কাটিয়েও গায়ে-গতরে ক্ষীণ হল না মণিকা। বরং ষোলোয় পা দিতে দিতে পুষ্ট হয়ে উঠল হাত-পা, মাংস লাগলো গালে, বুকে ইতস্ততঃ।

ষোলোর পর সতের আঠার তারপর উনিশ পেরিয়ে কুড়ির কোঠায় পা দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল মণিকা। তাকিয়ে দেখল ওর ওপোরে আকাশের শূন্যতা, পায়ের নিচে কঠিন মাটি আর সামনে পেছনে শুধুই নিরঙ্কুশ অন্ধকারের থইথই রাজত্ব। মেজ বোন কল্যাণী মারা গিয়েছে সাত বছর বয়সে। অঞ্জলির ওপর গেলবারে দয়া করে ভর করেছিলেন শীতলা মা। শেষকালে তাকেও টানলেন ভগবান। শুধু বেঁচে রইলো মণিকা। কুড়ি বছরের অতৃপ্ত কামনা বুকের অতলে পাষাণ চাপা দিয়ে দিন গুণতে লাগল। কিন্তু দিন যেন

ফুরোয় না। মনের পর্দা থেকে স্থবির চিন্তার ভার লাঘব হয় না কিছুতেই। মণিকা ভগবানকে ডাকে। নেশাখোর বাবার সংসারে গঞ্জনার অসীম সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ওর কুড়ি বছরের মনটা বিদ্রোহী-হয়ে ওঠে।

কিন্তু চালতাবাগান লেনের ঝুপসী বস্তীর মণিকা বিশ্বাসও পৃথিবী দেখেছিলো। বৌবাজার পাড়ার গোপাল চক্রবর্তীর ভালোবাসার আলোয় মণিকার পৃথিবী উজ্জ্বল হয়েছিলো। কুড়ি বছরের শাদা মনে রঙের প্রলেপ লাগল। সে বুঝি রামধনুর সাতরঙ। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের পেশাদারী থিয়েটার পার্টির হিরো গোপাল চক্রবর্তী বলত—তোমাকে লুফে নেবে আমাদের দল। সব আছে কিন্তু মনের মত একটা হিরোইন জুটছে না শালা।

নাট্যমঞ্চের ঝলমলে আলোয় হিরোইন হবার স্বপ্নই মণিকাকে গোপাল চক্রবর্তির নিজস্ব জীবনের হিরোইন করেছিল একদিন। চালতা বাগানের ঝুপসী বস্তীবাড়ি ধরে রাখতে পারেনি মণিকা বিশ্বাসকে। কণ্ডাক্টর বাবার ছাদফুটো, দেওয়ালধ্বসা ঘরের বন্দিনী মণিকার আকাঙ্ক্ষার কুঁড়ি পাপড়ি মেলেছিল। অনেক স্বপ্ন আর সাধ নিয়ে তাই গোপাল চক্রবর্তির হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল মণিকা। কালীঘাটের মন্দিরে মালাবদলের পালা শেষ করে, ওরা এসে উঠেছিল এখানে। এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের একটা পোড়ো বাড়িতে। কিন্তু মণিকার সাধ-স্বপ্ন কোনোটাই সার্থক হলো না। অনেক দূরে পড়ে রইল রঙ্গমঞ্চ, শুধু ওর নিজের জীবনের প্রতিটি দিন চরম নাটকীয়তায় শেষ হয়ে হয়ে রাত্রি নামতে লাগল।

কিন্তু মণিকা সুখী হতে চেয়েছিল জীবনে। সমস্ত অভাব-অনটন আর জ্বালা যন্ত্রণা সত্বেও শান্তি আনতে প্রয়াসী হয়েছিল। সে প্রয়াস সফল হয়নি। মোদো-মস্তান স্বামীর অসহ্য অত্যাচারে তাই বুঝি দিনে দিনে অনেক বেদনার মেঘ পুঞ্জীভুত হয়েছিলো ওর মনে। তিন বৎসর ধরে ধুকতে ধুকতে রক্ত বেরিয়ে আসছিল বুক চিরে।

এমন একটা মুহূর্তে বিশ্বনাথের সাহায্য আর সহানুভূতি পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল মণিকা। এমন কিছু ঘনিষ্ট পরিচয় তখনও হয়নি। কখনও কখনও গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে যেতে এবং আসতে দেখা। তারও আগে মাঝে মাঝে কাচের চুড়ি কিনতে আসত মণিকা। সেই আসা যাওয়ার পথে কোথায় যেন একটা ভীরু মমতা গেঁথে গিয়েছিল মনের পর্দায়।

বাড়িভাড়ার দায় থেকে উদ্ধারের জন্য ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল গোপাল চক্রবর্তি। সেই যে গেলো, আর এলো না। কিন্তু মণিকা বাঁচতে চেয়েছিল। সেদিন একমাত্র আপনজন ভেবে, অভাব অনটনের কথাটুকু সঙ্গোপন করার প্রশ্ন আসেনি। সব কথাই ও খুলে বলেছিল বিশ্বনাথকে। অতি সন্তর্পনে তুলে রাখা একজোড়া সোনার পাশার বদলে বাড়িভাড়ার টাকাটাই শুধু চেয়েছিলো মণিকা। বিশ্বনাথ অবশ্য দিয়েছিল। টাকাটা হাতে তুলে দিয়েছিল মণিকার কিন্তু পাশা জোড়া সে রাখেনি। বরং মণিকার প্রয়োজনের তুলনায় কিছু বেশিই হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলো—কখন কিসে প্রয়োজন হয় বলা যায় না। এটা রেখে দিন আপনি।

হয়তো প্রথমটা মনে মনে আহত হয়েছিল মণিকা। কিন্তু মণিকা ভাবল—ও নিজেও তো চাতুরী করতে কম করেনি। গোপাল চক্রবর্তি যে চলে গিয়েছে সে কথাটা গোপন করে গেছে ও। হয়তো আর ফিরে আসবে না গোপাল, অথবা আসবে কিন্তু মণিকাকে বাঁচতে হবে। অসীম যন্ত্রনার মধ্যে তাই বিশ্বনাথ একটা আশার আলোর মতই জলে উঠলো ওর জীবনে।

ফিরেও এল গোপাল। এসেও কিন্তু সুস্থির হ'ল না। বরং সন্দেহ করে বসল মণিকাকে। কি তুমুল ঝগড়াই না হ'ল সেই রাত্রে। কিন্তু দেহ পণ্য করে অর্থ সংগ্রহের কথা কোন মুহূর্তেও ও ভাবতে পারেনি। দুশ্চরিত্রা সন্দেহে সে রাত্রে গোপাল চক্রবর্তির মারধোরে মনের কোনের মমতার পাপড়িগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। কিছুই গোপন করেনি মণিকা। সব খুলে বলেছিল বিশ্বনাথকে।

কদিন করাত্রি ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করলো বিশ্বনাথ। কি এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ও নিজেই জানে না। বোঝে না। ওর চেতনায়, দেহে মনে, রক্তের অনুকণায় শুধু মণিকা আর মণিকা। নির্ঘুম যন্ত্রণায় যত রাত পার হ'তে লাগল তত যেন উপবাসী মনটা তীব্র ক্ষুধায় চন্‌মন্ করে উঠতে লাগলো। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারল ও যে—মণিকাকে ওর চাই। মণিকাই এ যন্ত্রণার ওপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারবে।

কথা হলো, তড়িঘড়ি দোকানপাট বেচে দিল বিশ্বনাথ। এবার ওর যাত্রার পালা। মনের গহনে পুষে রাখা সেই বিহঙ্গ মন পাখা মেলেছে। কালীঘাটের

মায়া আর বাঁধতে পারবে না ওকে। কিন্তু বাধা দিয়েছিলো দীননাথ, বলেছিলো—দেখ বিশে, জীবনের যেদিন যায়, তা আর ফিরে আসে না। সব কিছুই তোর। আমি বলতে পারি না, বলবার অধিকার নেই আমার। কিন্তু ভেবে দেখ, সুস্থির মনে আর একটু চিন্তা করে দেখ।

—আরে রাখ তোর দিনের কথা। বিরক্ত হ'য়ে জবাব দিল বিশ্বনাথ। ও সব আমার নেই। ছিলাম, ছিলাম কিন্তু আর থাকবো না।

—আর আসবি না? দীননাথের কণ্ঠটা ভারী-ভারী মনে হ'ল।

—না।

একবার চোখ তুলে বিশ্বনাথকে দেখেছিল দীনু। তারপর ত্রস্তে চোখ নামিয়ে চোখের জল গোপন করে সেই যে চলে এলো, আর গেলো না।

সেই রাত্রেই উধাও হ'য়ে গেলো পাখি-পক্ষিনী। কালীঘাটের মমতার বন্ধন কাটিয়ে মণিকাকে নিয়ে পালিয়ে গেল বিশ্বনাথ।

রামরাজাতলা ছাড়িয়ে গাড়ির গতিবেগ বাড়ল। তীব্র গতিতে এগিয়ে চলল ট্রেনটা। আর এতক্ষণ বাইরে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার পাট চুকিয়ে ফিরে তাকালো বিশ্বনাথ। তাকাল কামরার ভেতরে।

ইণ্টারক্লাশ কামরাটাতেও ভিড়ের কমতি নেই। ডানদিকের জানালা ঘেঁসে পাশাপাশি বসেছিল ওরা। বিশ্বনাথ আর মণিকা। কামরার ভিড়ের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে এনে মণিকার দিকে তাকালো বিশ্বনাথ। স্নিগ্ধ হাসতে চেষ্টা করল মণিকা কিন্তু মুখ যদি মানুষের মনের আয়না হয় তবে মণিকার সেই আয়নায় বিশ্বনাথ দেখতে পেলো ওর নিজের মতই মণিকার বুকটা বুঝি কাঁপছে ভয়-ভয়-অস্বস্তিতে। এই মুক্তির অবাধ হওয়ার মধ্যেও কোথায় যেন একটা ভয়ের কাঁটা খচ্ খচ্ করে বিঁধছে। কিন্তু কিসের সে ভয়? কোন কারণে? এই মুক্ত-খুশির অবাধ রাজত্বে কোন্ ভয়ে ওর মন বরফের মত জমে আসতে চাইছে? কথা কইল বিশ্বনাথ। এই ভেবে আর নির্বাক থাকতে সাহস করল না সে—যত নৈঃশব্দ, তত ভয়। তাই একটু স্নিগ্ধ হাসবার চেষ্টা করে মণিকাকে বলল—খারাপ লাগছে তোমার?

—খারাপ! ঠোটের কোণে এক ঝলক বিদ্যুৎদীপ্ত-হাসির ঝলক টেনে আনলো মণিকা—না-না. খারাপ নয়, খুব ভালো লাগছে আমার। খুব। কথা

শেষ করে চুপ করল মণিকা। জানালা দিয়ে একবার দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল বাইরে। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে এনে বিশ্বনাথের দিকে তাকালো, বললো—তোমার ?

—আমারও। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিশ্বনাথ।

উজ্জ্বল লাল রঙের ফিনফিনে একটা শাড়ি পরেছে মণিকা। বিশ্বনাথের দেওয়া শাড়ি। গভীর নীল রঙের আঁটসাঁট ব্লাউসে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে মণিকাকে। যেন ঝলক ঝলক আগুনের শিখার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমাহিত নীল আকাশের একটা অংশ। আর তার ওপরে মণিকার মুখখানা পদ্মের একটি রমণীয় কচি কুঁড়ি। তাকিয়ে রইল বিশ্বনাথ। ওর দৃষ্টিতে দুরন্ত একটা নেশার মাদকতা ঝিন্‌ঝিন্‌ ক'রে উঠল।

মণিকা হাসলো। পদ্মপাপড়ির মত ঠোঁট দুটো কাঁপল ওর। কি একটা ইশারাও করল মণিকা। কিন্তু অতটা বুঝতে পারল না বিশ্বনাথ।

মুখটা আরও এগিয়ে এনে ফিসফিস্‌ করে মণিকা বললো—অমন করে তাকাতে নেই।

—কেন ?

—লোকে সন্দেহ করবে।

সন্দেহ! এতক্ষণে যেন মণিকার মনের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেলো বিশ্বনাথ। মণিকার মনে এখনও ভয়ের রৌদ্র-ছায়ার খেলা রয়েছে। বিশ্বনাথ নিজে যেমন হাজার চেষ্টা করেও মনের পর্দা থেকে ভয়টুকু মুছে ফেলতে পারছে না, মণিকাও তাই।

নামবার কথা ছিল দেউলটিতে কিন্তু ওরা নেমে পড়ল বাগনানে। ততক্ষণে রাত প্রায় আধাআধি। একটা কিছু যানবাহনের চেষ্টায় ঘুরাঘুরি করে নিরাশ হ'য়ে ফিরে এল বিশ্বনাথ। বলল—রাতটা বুঝি এখানেই কাটাতে হয় মনু।

—না—না, চমকে অস্ফুট আর্তনাদ করল মণিকা। যেমন হোক এই রাত্রিতেই এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তুমি যাও লক্ষীটী, দেখ একটু চেষ্টা করে।

গাড়ি একটা দ্বিগুণভাড়ায় মিলল। গরুর গাড়ি। আর তাতেই উঠে বসল ওরা। উঁচুনিচু পথ বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ঝাকুনি দিয়ে, ছইয়ের সামনে টাঙানো লণ্ঠনটা দোল খাইয়ে এগিয়ে চলল গরুর গাড়ি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল ওরা। এবার কথা কইলো বিশ্বনাথ, বললো—চুপচাপ যে?

—এমনি।

মণিকার পিঠের ওপোর আলগোছে একটা হাত তুলে দিয়ে ঘন হ'য়ে বসলো বিশ্বনাথ। একটু যেন এলিয়ে দিল দেহটা। আর অমনি আস্তে করে হেসে উঠল মণিকা, বললো—জানো, একটা কথা মনে পড়তে না হেসে পারলাম না। ট্রেণে বসে এমন করে তাকাচ্ছিলে তুমি·····

—কেন, ভয় করছিলো তোমার?

—করবে না? বাব্বা! কামরা ভরতি অত লোক আর তুমি হাঁ করে··· কথা শেষ না করে মণিকা ওর দেহে ঢেউ তুলল।

—তখন ভারি সুন্দর লাগছিল তোমাকে। মণিকার চুলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বললো বিশ্বনাথ।

—আর এখন?

—এখনও।

আজও মনে আছে বিশ্বনাথের ভোর ভোর আলো ফুটতেই বাকসী পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। সাঁতরাদের ধানকলের সীমানা পেরিয়ে আগে থেকে ভাড়া করা সেই হাট বরাবর বাসাটাতে সংসার পেতেছিল। আর কেউ নেই। শুধু বিশ্বনাথ আর মণিকা, মণিকা আর বিশ্বনাথ।

দুটো বৎসর ধরে কি উদ্দাম রমণীয় দিনগুলোই না কেটে গেল সেই রূপনারায়ণের পারের কাছাকাছি বাসাটাতে। কিন্তু তিন বৎসরের মাথায় ধরা পড়ল সব। মণিকার বুকে সর্বনাশা ধ্বংসের বীজ। হঠাৎ একদিন খক্‌খক্‌ কেশে উঠল মণিকা। চোখ দুটো অসম্ভব লাল হ'য়ে উঠল। সে কাশি বন্ধ হয় না। আর দেখে হঠাৎ শক্ত কাঠ হ'যে গেল বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, ঝলক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসছে মণিকার কণ্ঠনালী পেরিয়ে।

কাশি বন্ধ হ'তে নিজের হাতে ধুইয়ে মুছিয়ে পাঁজাকোল করে মণিকাকে বিছানায় শুইয়ে দিলে বিশ্বনাথ। বসলো মাথার কাছে। আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল মণিকার বক্ষে।

মণিকা হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে ও তাকাল বিশ্বনাথের দিকে,

বলল—আমাকে ফেলে যেও না তুমি, যেওনা। নিষ্পলক চোখে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল মণিকা, বলল—মরতে আমার বড় ভয় করে গো! কিন্তু পাপ। এ আমার পাপের সাজা।

একটা বৎসর ধরে অনেক দিন রাত্রির প্রহরে নির্ঘুম চোখে শিয়রে জেগেছে বিশ্বনাথ। কত কথা বলেছে মণিকা। কিন্তু সব কথা সেই গীটারকণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো। শেষ হ'য়ে গেলো। হঠাৎ চোখ বুজলো মণিকা। সেই যে বুজলো আর তাকালো না! পৃথিবীর বুক থেকে চিরকালের মত সে দৃষ্টিটুকু হারিয়ে গেল।

তারপর শ্মশান। স্বামী-স্ত্রী বলেই জানতো স্থানীয় লোকেরা। তাদের সাহায্যেই রূপনারায়ণের তীরে মণিকার সেই পরম মধুর দেহটা ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। মণিকা নামে একটি মেয়ের অস্তিত্ব মুছে গেল চিরকালের মত।

চিতার আগুন নিভল। এক এক করে এগুল সকলে। টানলও বিশ্বনাথকে। কিন্তু বিশ্বনাথ যায়নি। কোথায় যাবে ও? কোনখানে? সব হারিয়ে সেই শূন্য ঘরে কোন প্রাণে ও পা বাড়াবে?

অনেকক্ষণ রূপনারায়ণের পারে বসে রইল বিশ্বনাথ। জোয়ারের জলে যৌবন ফিরে পেয়েছে রূপনারায়ণ। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মণিকার চিতার সবটুকু অস্তিত্ব। তারপর আর কী রইল?

ঘর ছিল, সংসার ছিল, ছিল অনেক কিছুই, কিন্তু সব পেছনে পড়ে রইল। সেই নিঃসীম অন্ধকারে দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলো বিশ্বনাথ। শুনলো জোয়ার ফাঁপা রূপনারায়ণের কান্না। তারপর একখানা মাত্র কাপড় সম্বল করে নগ্নপদে ও হাঁটতে লাগল রূপনারায়ণের পার ধরে।

আজ মনে পড়ছে মণিকাকে নিবিড় করে পাওয়ার মুহূর্তে কেমন একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা হা হা করতো ওর বুকে। নেশাগ্রস্থের মত বিশ্বনাথ বলতো—তোমার এই দেহের ভাঁজে এত নেশা তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ মন্তু?

মণিকা হাসতো। হেসে হেসে বলতো—সব গোপন কথাই যদি ধরতে পারবে তোমরা, তবে মেয়েদের আর থাকলো কী? তার চেয়ে তুমি বলো, আমি শুনি।

শেষ দৃশ্যটা এখনও যেন দৃষ্টির পর্দা থেকে মুছে যায়নি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কাশি উঠলো মণিকার। অনেক রক্তপাত হলো। তারপর একটু সুস্থ

হয়ে মণিকা বলল—একটা কথা তোমাকে বলে যাই, তুমি আমার সব, তুমি আমার স্বর্গ কিন্তু, হাঁপাতে গিয়ে মণিকা থামলো। একটু চুপ করে থেকে বলল---কিন্তু সে আমার দেবতা। অনেক চেষ্টা করেও তার কথা ভুলতে পারিনি। সে মাতাল, সে বদমাস—, সব, কিন্তু· ····মণিকা বিশ্বনাথের দিকে তাকালো, বললো—ক্ষমা করো আমাকে। নিজের মনের আগুনে নিজেই শেষ হলাম। শুধু ভুগিয়ে গেলাম তোমাকে। এ আমার পাপের শাস্তি।

তিন তিনটি বৎসর ঘর করে, হেসে খেলে নেচে গেয়ে সময় কাটলো। কিন্তু আজ ভাবতে গিয়ে বিস্ময় লাগে বিশ্বনাথের, এত লাঞ্ছনা গঞ্জনার পরও মণিকা গোপালের কথা ভুলতে পারেনি। সেই না পারার আগুনেই ও পুড়িয়ে মেরেছে নিজেকে।

আট

দুপুরের কাজের অবসরে বারান্দায় বসে চুপচাপ সেলাইয়ের কাজ করছিলো যমুনা। ছেলে কমলের একটা সোয়েটার নিয়ে বসেছে কিন্তু সে আর শেষ হয় না। সংসারের এটাওটা নানাকাজে কোথায় দিয়ে যেন দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। তারপর দেখতে দেখতে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সেলাইয়ের কাজটা আর হাতে তোলা হয় না। আজ তবু একটু সময় হ'য়েছে হাতে। আজকাল দুপুরের দিকে ঘুমোবার অভ্যেসটা কাটিয়ে উঠেছে যমুনা। তাই বসে বসে সেই সোয়েটারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বসে বসে খেলা দেখছে ছেলে কমলের। ছেলেটা এমনি দুরন্ত হয়েছে, দুপুরে না ঘুমোবে, না থাকবে একটু সুস্থির। এটা সেটা, একটা কিছু-না-কিছু নিয়ে মেতে থাকবেই। কমলের বাবা গেছেন দোকানে। তা দোকানও তো আব কম দূর নয়! অতদূর থেকে লোকটা দুপুরে খেতে আসে। যেন ঘোড়ায় চড়ে আসা হয়। এসেই নাকে মুখে চারটি গুঁজে সঙ্গে সঙ্গে দৌড। বাসা থেকে সাঁত্রাগাছির বাজার প্রায় এক মাইলের কাছাকাছি। আগে বাজারেব কাছাকাছিই বাসা ছিলো। কিন্তু ওপাড়াব ছেলেপুলে লোকজন বড স্থবিধার নয়, তাই এই বাসা। তাও অনেক খুঁজেপেতে, তবে। যমুনা শুনেছিলো বাসা পাওয়া কঠিন একমাত্র কোলকাতাতেই কিন্তু এখানে যখন বাসাবদল হ'লো, তখন বুঝলো সাঁত্রাগাছিও কোলকাতা থেকে এমন কিছু কম নয়।

দেশে ব্যবসাপাতি স্থবিধের নয়। তাই গুনীন অনেক বুদ্ধিপরামর্শ করে যমুনা আর কমলকে সেখানে রেখে, এদিকে এসেছিলো কিছু একটা কববার মতলবে। অবশ্য ফিরে এলো দিন বারোর মধ্যেই। কিন্তু ফিরে তো এলো না হয়; তার আগে তো যমুনা ভেবেচিন্তে কুলকিনারাই পাচ্ছিলো না। যে লোকটা সাতদিনেব নাম করে গিয়েছে, তা আটদিন গেলো, ন'দিন গেলো, দশ, এগারো তাও যায় কিন্তু মানুষটার নামে আর পাত্তা নেই। কী চিন্তা! কী চিন্তা! শেষকালে সেই লোক এলো কিনা বারোদিন পর।

যমুনা হাত পা ধোবার জল দিলো, জলখাবার এনে সামনে বসলো, তারপর বললো—এই বুঝি তোমার সাতদিন?

খেতে খেতে গুনীন বললো—কাজে বেরুলে কি আর দিন ঠিক রাখা যায়?

হুট্‌সই একটা ব্যবসার হদিশ পেয়ে গেলাম। আমার এক বন্ধু থাকে সাঁত্রাগাছি, তার ওখানেই উঠেছিলাম। খোঁজ খবর সেই দিলো। আমিও দেখলাম কম দামের মধ্যে আর অত ভাল পজিশনে দোকানটা যখন পেয়ে গেলাম, যাক একটা ব্যবস্থা করেই যাই। ছাড়বো কেন।

—তা ব্যবস্থাটা কি হলো শুনি ?

—ঠিকঠাক করে এলাম সব। কাপড়ের দোকান করবো সাঁত্রাগাছি বাজারে। পুরোনো একটা দোকান খুব কমদামে পেয়ে গেলাম। একেবারে বাজারের বড় রাস্তার ওপর। টাকা পয়সা লেনদেন করে, লেখাপড়া শেষ করে তবে তো বেহাই পেলাম।

—কিন্তু এদিকে ?

খেতে খেতে মুখ তুললো গুনীন, বললো—এদিকে আবার কী ? সব বেঁচেবুচে দেবো। কথাবার্তা তো কিছু কিছু আগেই বলে গিয়েছি কয়েক-জনকে। এখন সব ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। বিদেশ বিভূঁয়ের ব্যাপার, কিসে কি হয় বলা যায় না। লোকজনের যে কি ভিড় বেড়েছে সে কথা তোমাকে কি বলবো। সব, ব্যবসার তালে ঘুরছে।

—তা না হয় বুঝলাম, যমুনা বললো, কিন্তু আমাদের নিয়ে উঠবে কোথায়, তোমার দোকানে ?

—কী যে বলো তার ঠিক নেই। দোকানে উঠবে কোন দুঃখে ? আমি একেবারে বাসা পর্যন্ত ঠিক করে এসেছি।

হেসে ফেললো যমুনা, বললো—বুদ্ধি তো সব দিকেই আছে, শুধু

গুনীনও হেসে ফেললো। হেসে বললো—থাক ও কথা অনেকবার শুনিয়েছ আমাকে।

রাত্রিতে খেতে বসে আর এক প্রস্থ আলোচনা। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর দোকান আর জমিজমা বিক্রীর তালে বেরিয়েছিলো গুনীন। অবশ্য আগে থেকেই প্রায় সব ঠিকঠাক। ব্যবসার মন্দা দেখে স্থানান্তরে যাওয়া সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেই এসব পাকাপাকি করেছিলো গুনীন।

যমুনা বললো—সবই তো হোলো কিন্তু হুট করে তো আর যাওয়া যায় না।

-কেন ! বিস্ময় প্রকাশ করলো গুনীন।

—মার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা কি সঙ্গত হবে ?

—তবেই হয়েছে। এক ঝলক নিরাশা ছড়ালো গুনীন, বললো—সাত-দিনের মধ্যে যেমন করে হোক রওনা না দিলে, সব মাঠে মারা যাবে আমার।

—বেশ তো, তুমি যাও। আমি আর পুতুলা না হয় পরে যাবো। এখন গিয়ে মার কাছে থাকি কিছুদিন।

—দেখ, ওসব ঝামেলা করো না এখন, প্রায় অভিমানের সুরই যেন ফুটে উঠলো গুনীনের কণ্ঠে। একলা গিয়ে আমি কি থই পাবো নাকি? দুটো বুদ্ধি-পরামর্শও তো করতে হয়। তা ছাড়া কোথায় থাকবো, কোথায় খাবো তার ঠিক নেই।

—কেন, বাসাতো করাই আছে। যমুনা বললো।

—থাক না। বাসায় বসে থাকলে তো আর হবেনা, মাল কেনাবেচা কত কাজ। তার চেয়ে বরং এসব বুদ্ধিশুদ্ধি বাদ দিয়ে চলো আমার সঙ্গে, পরে না হয় . .

—তাই বলে মার সঙ্গে দেখা করবো না?

—আহা! বিরক্তি প্রকাশ করলো গুনীন। না হয় তোমরা গেলে, আর আমিও গেলাম কিন্তু তারপর?

— তারপর আবার কী?

—তোমাদের পৌঁছে দেবে কে সাঁত্রাগাছি? দোকান ফেলে নিয়ে আসতে পারবো না আমি।

অনুপায় হয়ে মত দিলো যমুনা।

সেই সাঁত্রাগাছি আসা। তারপর ও পাড়ার নবণ বাবণ দেখে এই বাসা করা হয়েছে। এর মধ্যে জমি জায়গাও কিছু কেনা হয়েছে। সামনের বছর নাগাদ বাড়ির কাজ সুরু হবে। সুরু হলেই বাঁচা যায় বাবা, পরের ঘরদোরে কিছুতেই আর মন টেকে না যমুনার। এর সঙ্গে লাগো, ওর সঙ্গে লাগো, ঝগড়া ঝাঁটি করো বাড়িওয়ালার সঙ্গে। নিজের ঘর-বাড়ি হলে ও সব ঝামেলার বালাই নেই। দিব্যি খাও দাও ঘুমোও আর সংসারের কাজকর্ম দেখো।

ব্যবসা এখানে ভালোই চলছে গুনীনের। নতুন যে বাড়ি হবে, গুনীনের ইচ্ছা দোতালা দালান তুলবে কিন্তু যমুনার তাতে আপত্তি। যমুনা বলে—দেখো, এখন দোতালা-ফোতালা থাক। এখন একতলা তোলো। পরে সুযোগমত দোতলা তুললেই হবে। এই তো কজন মাত্র প্রাণী আমরা, দোতলা

দিয়ে হবে কি এখন? শুধুশুধু কতগুলো টাকা আটকানো। তার চেয়ে বাপু টাকা কটা ব্যবসায় খাটাও।

—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি, হাসলো গুনীন; সে সব তোমার ভাববার দরকার নেই গো। বাড়ির টাকা আমি আলাদা করেই রেখেছি। ব্যবসার টাকার আর দরকার কি? দোতলার খরচ পুরোই তো রয়েছে হাতে। এতদিন কষ্ট কষ্ট করলাম, তা দোতলায় বসে একটু আরাম করবো না?

—ইস্, বুড়ো বয়সে সখ দেখি লতাচ্ছে তোমার! অত আরামের দরকার নেই আমার। ছেলে বড় হোক, তখন না হয় দেখা যাবে।

—ও, হাসলো গুনীন, বললো—ছেলের বউ ঘরে এনে তবে বুঝি দোতলা তুলবে?

—হ্যা গো হ্যা, হয়েছে?

—সেটি হবে না। কেন, আমরা কি ভেসে এলাম নাকি? আমরা স্বামী-স্ত্রী না হয়, মুখতুলে কৌতুক করে হাসলো গুনীন যমুনার চোখের দিকে তাকিয়ে, বলল—বয়স বাড়ছে বলে কি একটু সখ-টখও থাকবে না?

—থাক থাক, দিনেদিনে কী যে হ'চ্ছ তার ঠিক নেই। কোন কথাই আর মুখে আটকায় না দেখতে পারছি। তা, স্বামী স্ত্রীতে সারাজীবন কমটা হলো কিসে?

দুপুরের এই সময়টা কোন কাজকর্মই থাকে না হাতে। একটু আরাম করে ঘুমোন টুমোন পর্যন্ত আসে না ছাই। তাই বারান্দায় বসে বসে ছেলের খেলা দেখছে যমুনা।

ছেলে সঙ্গী পেয়েছে একজন। পাশের বাসার শুইচরণ বাবুর মেয়ে। ফর্সা রঙ আর কোঁকড়ান এক মাথা ঝাঁকরা চুলে কি চমৎকারই না মানিয়েছে মেয়েটাকে! ওরা দুজনে খেলছে। ঘর-করনার খেলা খেলছে দুজনে।

দেখে দেখে নিজের জীবনের অনেক কথাই মনে পড়ছে যমুনার। ছোট-বেলার সব স্মৃতিগুলো স্পষ্ট মনে নেই। আয়নার পেছনের পারা প্রলেপটা মাঝে মাঝে উঠে গেলে ঠিক যেমন হয় আয়নার অবস্থা। সব দেখা যায় না পুরোপুরি। ঠিক তেমনি মনের আয়নার প্রলেপ মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে যমুনার। সে আয়নায় সব কিছু আর স্পষ্ট দেখতে পায় না ও। তবুও

কতগুলো স্মৃতি এখনও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে মনের মনিকোঠায়। উজ্জ্বল সেই টুকরো স্মৃতিগুলো যেন জ্বলছে।

একথা ভাবতে গিয়ে আরও একটা কথা মনে পড়লো ওর। অনেকদিন গ্রামের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। জানা নেই। সেই লোকটা কি এখনও ফেরেনি? এই এত বৎসরেও কি ফিরতে পারেনি? যদি না-ই ফিরে থাকে, তবে কোথায় গিয়েছে? সন্নেসী হয়ে পালিয়েছে, না অঘাটে কুঘাটে কোথাও পড়ে মারা গেছে ?

এ কথা মনে আসতেই কেমন যেন হাসি পেলো যমুনার। একদিন কি ছেলেমানুষিই না করেছে লোকটা। এত ভীরু! কেন, কোন্ কারণ ঘটেছিলো এমন যে তোমাকে পালিয়ে যেতে হবে! যমুনার জন্য? তাই যদি হয়, তবুও কি ছেলেমানুষি করোনি?

কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে ওর মনটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠলো। আগে যেমন প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তার কথা মনে পড়তো, বিয়ের দুই তিন বৎসরের মধ্যে ওই একটা চিন্তায় ভরে থাকতো মনপ্রাণ সর্বক্ষণ, আজ আর তেমন করে মনে পড়ে না। নিজের সংসার, নিজের ছেলেমেয়ে, স্বামী এদের নিয়ে, সব দেখেশুনে দিনেদিনে সব মেয়েরাই বুঝি পেছনের জীবনের কথা ভুলে যায়। যমুনার মনে হয়, আসলে মেয়েদের মন ঠিক পদ্মের পাতার মত। কতবার কতবিন্দু জল ওঠে সেই পদ্মপত্রে, আবার আপনিই বুঝি সরে যায়। পদ্মপাতায় জলের চিহ্ন থাকে না। মেয়েদের মনও ঠিক তেমনি। তার সব স্মৃতি ওই জলবিন্দুর মতই বুঝি মনের পদ্মপাতায় ক্ষণস্থায়ী। আসবে, আবার যাবে। কারও উপায় নেই স্থির হয়ে থাকবে চিরকাল। তাই যদি থাকতো, তাহলে এই যমুনাই কি এমন করে ভুলে যেতে পারতো সে দিনের কথা, সে লোকটার কথা! যার প্রতিটি স্মৃতিবিন্দুতে কি এক রমনীয় মাদকতা রয়ে গেছে।

কিন্তু ভুললেও সবটা কি ভুলতে পেরেছে যমুনা? না, পুরোটা ভুলতে পারে নি আজও। ঘষা আয়নার কাচের মত যদিও একটু অস্বচ্ছ ফ্যাকাশে হয়ে আসছে, তবুও সংসারের কাজকর্ম, স্বামী-ছেলের পরিচর্যার পর যখন একলাটি বসে, সেই ফাঁকে মনে পড়ে। আর মনে পড়লেই সহসা ওর বুকটা বেদনায় তোলপাড় করে ওঠে। তখন কিছুই ভালো লাগে না ওর। মনে হয় চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে স্মৃতির সমুদ্রে হাবুডুবু খায়।

অনেকদিন পর ছেলে আর ওই সুন্দর মেয়েটার খেলার ধরণ দেখে যমুনার মনের সেই পুরোণো স্মৃতিগুলো যেন কথা কয়ে উঠতে চাইছে। ওর মনটাই পিছিয়ে যেতে চাইছে দশ এগারো বারো অথবা আরও বেশি বছর আগে। সেই সময়ে, যখন ওরা ছুটিতেও ঠিক এমনি ছিল। এই ছেলেটা আর মেয়েটার মত ঘর-করনার অপটু অভিনয় করতো।

ছোটবেলার সেইসব কথা আর স্মৃতিগুলোতে আজ আর তেমন রঙ রসের প্রাচুর্য আছে বলে মনে হয় না। তবুও এমনই মাদকতা যে ভাবতে বসে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ভাল লাগে এই কারণে যে, সেই ছোট-বেলার স্মৃতি থেকেই একটু একটু করে এগিয়ে এলে ওরা পরিণত বয়সে পড়বে। আর সে বয়সের রোমাঞ্চ কখনও কি কেউ যে কোন মূল্যের বিনিময়ে ভুলতে পারে, না পেরেছে ?

বিয়ের ঠিক আগে যমুনার বয়স ছিল চৌদ্দ। আর বিশ্বনাথের তখন বছর বাইশের যুবক। সেই ছোটবেলার স্মৃতির লতা ধরে ধরে এই পর্যন্ত এসে থমকে যায় যমুনা। থমকে পড়ে ওর মন। অনেক কথা মনে হয় তখন। মনে হয় সেই লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করা, সঙ্গোপনে মগ্ন হ'য়ে বসে কত কথা, কত গল্প, আর মনে পড়ে বিয়ের ঠিক ক'দিন আগেকার কথা। তখনও সে চলে যায় নি। যখন মনে হয় সে সব কথা, নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে যমুনা বলে—কি ক'রে অমন ছেলেমানুষী করতে পেরেছিলাম সেদিন ?

কিন্তু সেই যে ছেলেমানুষি, তার নেশা, তার মাদকতা রোমাঞ্চ সেকি এই দৈনন্দিন জীবনে হর্ষের সঞ্চার করে না ? রমনীয় একটা অনুভূতিতে ভরে ওঠে না মনপ্রাণ ?

সেদিনের জীবনের সঙ্গে, আজকের জীবনের কত তফাৎ। কি আশ্চর্য ব্যবধান। বিয়ের পরের দু' তিনটা বৎসরের সঙ্গেও। বিয়ের ঠিক পর থেকে যমুনার মনে যে ভয়, যে সংশয় আর অস্বস্তির বোঝা চেপে ভারী করে তুলেছিলো মন, আজ সেই সমকালীন সংশয় কোথায় ? আজ স্বামী-পুত্র নিয়ে সুস্থ সংসার ওর। কেমন করে আস্তেআস্তে সব কিছুই বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভে বিলীন হ'তে বসেছে। আস্তে আস্তে সব কিছু পাশে সরিয়ে রেখে সংসারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ও। দেখতে দেখতে সংসার সুখের হ'য়েছে। ও স্বপ্ন দেখছে নিজের ঘর-বাড়ির। এবং আজ সে স্বপ্ন সার্থক

হ'তেও চলেছে। দোতলা, একতলা আর ওই ছোট্ট ছেলে, একরত্তি পুতলা সেও একদিন বিয়ে করে বউ ঘরে আনবে। সে চিন্তাও যে মাঝেমাঝে করে না, এমন নয়।

শুঁইচরণবাবুর মেয়ে আর যমুনার ছেলে পুতুলখেলা খেলছে। আর ঘর করণার খেলা। দেখেদেখে পুরনো একটা স্মৃতিকণা তোলপাড় করছে যমুনার বুকের অতলে।

সেই ভল পুতুলটার কথা মনে পড়ছে বারবার। ছোটবেলার সেই ভল। আনুর পুতুল।

দক্ষিণদুয়ারী ঘরের পেছনে একটা জামরুল গাছ। অনেক জামরুল ধরতো গাছটায়। নিচে চমৎকার ছায়া। ঝরঝরে তকতকে জায়গাটা। বিশ্বনাথ আর যমুনা ওই পুতুলটাকে নিয়ে ঘর-করণার খেলা খেলতো ওখানে।

অপটু হাতে শাড়ি পরে, পুতুলটাকে কাঁকালে নিয়ে মায়ের অভিনয় করতো। ছেলের বাপ বিশ্বনাথ।

কি একটা শব্দে চমকে উঠলো যমুনা। কে ডাকছে না? হ্যাঁ, মা ডাকছেন। নীরজাসুন্দরী।

এতক্ষণ বিশ্রাম করছিলেন নীরজাসুন্দরী, এইবার উঠে এলেন। এসে দাঁড়ালেন যমুনার পাশে। দাঁড়িয়ে বললেন—বেলা তো পড়ে এলো লো। ছেলেকে এবার ধুইয়ে মুছিয়ে সিজিল মিছিল করে, তবে বোস।

—খেলুক না হয় আর একটু, মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো যমুনা. সবে তো পড়লো বেলা।

নীরজাসুন্দরী পাশে বসলেন। কদিন থেকেই তিনি লক্ষ্য করছেন ঝাকড়া চুলের ওই সুন্দর মেয়েটার সঙ্গে নাতির সারাদিন মেলামেশার ধরণটা। আজকাল তাঁর এসব বড একটা ভালো লাগে না। এক সময় গেছে, যখন তিনিও দেখতেন। বসেবসে অনেক সময় দেখতেন যমুনা আর বিশ্বনাথের খেলা। সে ওদের ছোট বেলায়। তারপর যখন বড হলো ওরা, কত গত হ'লেন তখন আর সময় হয় নি। সময় যদি বা হতো কিন্তু মন ছিলো না। সেই মন না থাকাতেই লুকিয়ে চুরিয়ে কিসে কি হ'য়ে গেলো। যমুনা পাগল হলো বিশুর জন্য আর বিশুও পালিয়ে গেলো সন্ন্যাসী হ'য়ে। সেদিনের সেই ভুলটা আজও মনে বড পীড়া দেয় নীরজাসুন্দরীর। মনে মনে পীড়িত হন। শুধু পীড়িতই যে হন, তা নয়। রিতিমত ভয় পান। সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয়

পাবার কথাই। কম তো আর শিখলেন না! সেই যে ছেলেটা পালিয়ে গেলো, আর কোন সংবাদ পাওয়া গেলো না তাঁর। সে যে যমুনার জন্যই পালিয়ে যায়নি একথা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু একটা মেয়ের জন্য এমন করে একটা লোক পালিয়ে যাবে, সে কথা কি নীরজাসুন্দরীই ভাবতে পেরেছিলেন কোনদিন ?

নাতি কমল আর ওই মেয়েটার খেলা দেখলে সেই কথাই মনে পড়ে নীরজাসুন্দরীর। আজ শহর-বন্দর-গ্রামে কত কাণ্ড কারখানাই না হ'চ্ছে দিনে দিনে। এরওর কাছে তো শোনেনই, যমুনাও বলে। এইতো সেদিন যমুনা বলছিলো—পাড়ায় কোন ছেলে নাকি ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কোন মেয়ের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা ছিলো, মেয়েটার বিয়ে হ'য়ে গেলো অন্যখানে। আর সেই দুঃখে বাবু গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন।

শুনে চমকে উঠেছিলেন নীরজাসুন্দরী। এমনও হয় নাকি! আর সেই ভেবে তাঁর মনে সেই থেকেই একটা ভয় সজাগ হ'য়ে রয়েছে। সেই যে শম্ভুর পালালো, সেও কি তাহ'লে এই যমুনার জন্যই! সেই যে গেলো আর খবর নেই। কিন্তু সেও যে বন বাদাড়ে এমন একটা কাণ্ড করে বসেনি, সে কথাই বা কে বলতে পারে? ওকথা যখনই ভাবেন নীরজাসুন্দরী তখনই কেমন যেন নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। অথচ নীরজাসুন্দরী কি করেছেন? কি বলেছেন ছোড়াটাকে? আর বুড়োমানুষ কখনও যদি কিছু বলেই থাকেন, তাতে আর অন্যায়টা হ'লো কিসে। বুড়ো বয়সে কি বিচার ক'রে সব কথা বলা যায় নাকি?

এসব ভেবেও কিন্তু মনে স্বস্তি পান না নীরজাসুন্দরী। যত ভাবেন তত অপরাধী মনে হয় নিজেকে।

কমলের ওই খেলার ধরণে এই জন্যই তাঁর আপত্তি। একটা ঘটনা নিজে চোখেই তো দেখেছেন। আরও একটা ঘটনার কথা যমুনার কাছেই শুনলেন। শুনে বুঝলেন, মেয়ের সঙ্গে ছেলের বেশি মেলামেশা করতে দেওয়াটাও খারাপ কথা। এই কমলই যে একদিন বিশুর মত করে বসবে না অথবা যমুনার গল্পের সেই ছেলেটির মত ঝুলবে না, সে কথাই বা কে বলতে পারে?

মাস দুই আগে নীরজাসুন্দরী চলে এসেছেন মেয়ের কাছে। চলে

এসেছেন বরাবরের মত। দেশে তাকে দেখবে কে, আর আছেই বা কি? দেখলেই কি থাকবার জো ছিলো নাকি? চারদিকে সব শত্তুরের দল। অমন যে ধার্মিক লোক ঈশান চন্দ, কথায় কথায় ভগবান ভগবান করে অস্থির; সেই কি কম ফাঁকিটা দিয়েছে নাকি? কত বিশ্বাসই না করেছিলেন নীরজাসুন্দরী ঈশান আর তার বউ মনোরমাকে। আগে মনে করেছিলেন, মনোরমা একেবারে মাটির মানুষটি। দাঁত চড়ে না নেই মুখে। কিন্তু পরেও তো দেখলেন। দেখলেন, ওমা! এ যে গোখরো সাপের বাচ্চা গো। দুধ দিয়ে সেই কালসাপই পুষেছিলেন নীরজাসুন্দরী।

আজ বুঝতে পারছেন কেষ্টর মাকে যে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেও ওই মনোরমার বুদ্ধিতে। দিনে দিনে কত কথাই না বলতো মনোরমা, বলতো— আমি যখন রয়েছি, কী লাভ আর একটা বাইরের লোককে ভাত দিয়ে পুষে? খরচ কি কম নাকি? বাড়তি লোকের দরকারটা কি এখন?

প্রথম দিকে আপত্তি করেছেন নীরজাসুন্দরী, বলেছেন—কিন্তু তুই কি আর সব দিকে একলা পেরে উঠবি মনো? তা ছাড়া মেয়ে মানুষটার আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। একেবারে অনাথাই ধরতে গেলে। আমার এখানে তবু যা হোক কাজকর্ম ক'রে ট'রে খাচ্ছে।

—আমিও সেই কথাই বলছি, মনোরমা বললো। তোমারও তো একটা ভবিষ্যত বলে কথা আছে। দু পয়সা যদি জমাতে পারো তীর্থ ধর্ম করতে পারবে মনের মত।

—তা যা বলেছিস মনো। মনের বাসনা মনেই চেপে রইলাম লো, সে আর আমার হলো না। কত পাপই যে ভগবানের চরণে করেছিলাম রে।

—না-না, পাপ করবে কেন? তোমার মত অমন করে ভগবানকে ক'জন ডাকে সংসারে? আসলে কিছু না জমলে যাবে কি করে? বিদেশ বিভুঁয়ে গেলেই পয়সা কড়ির প্রয়োজন। তাই বলছিলাম দিদি।

—কিন্তু আমার যেন কেমন লাগছে লো মনো। মেয়েমানুষটা মা মা করে অস্থির। কি করে আমি ওকে জবাব দেবো বলতো?

—দেওয়া না দেওয়া তোমার অভিরুচি, মনোরমা যেন মুখভার করলো। আর তুমিই বা কত পারবে। দুটো বাড়তি লোক সংসারে কম কথা নাকি?

—সে কথাটাও ভাবতে হয় বই কি, নীরজাসুন্দরী বললেন, কথাটা তুই একেবারে খাটিই বলেছিস।

এবার একটু পুলকের রঙ দেখা গেলো মনোরমার মুখে—হ্যাঁ, অথাটি কথা তোমাকে বলতে যাবো কোন সাহসে? মানুষের বিপদ-আপদ আছেই সংসারে। ভগবান না করুন, যদি একটা অসুখে বিসুখেই পড়ে যাও, কে দেখবে তোমাকে? কেষ্টর মা-তো শুদ্দুর, তার হাতে তো এসব চলবে না তোমার।

কথাগুলো অনেক ভেবেছিলেন নীরজাসুন্দরী। মনোরমা কথাগুলো মন্দ বলে নি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছেন সবটাই চক্রান্ত। ওই ছুতো-নাতায় না ভুললে হয়তো এমনটা হতে পারতো না। কেষ্টর মাকে নীরজাসুন্দরী তো জানতেনই। একটু কাটা-কাটা কথা বলতো যদিও কিন্তু অমন মন কটা মেয়েমানুষের হয়? আজ বুঝতে পারছেন কি ভুলটাই না করেছেন নিজের বুদ্ধির অগোচরে, পরের বুদ্ধিতে ভুলে। কেষ্টর মা বুঝতে পেরেছিলো আসল ব্যাপারটা, তাইনা যাবার সময় বলে গেলো—আমার আর দুঃখ কি মা? আবাগী মানুষ, দশ দুয়ারে খেটে খাবো। কিন্তু যে ভালোমানুষেরা তোমার ভাল করতে যাচ্ছে, পথে বসিয়ে তারা আর ফিরেও তাকাবে না কোনদিন।

সেই কথাটাই সত্য হলো। কিন্তু নীরজাসুন্দরী কি করে জানবেন যে যে এমন কুলচক্র কথা তুলে তাকে ছোবল মারবার ব্যবস্থা করছে ওরা। তা নইলে ফের যখন ঈশান চন্দ্র এসে পুরো একটা মাস রইলো, কত বুদ্ধিই না দিয়েছিলো লোকটা। কত তীর্থ-ধর্ম, রাজ রাজত্ব দেখাবে বললো, বললো—বউঠান! বড় কঠিন জায়গা এই সংসার। আর আমাদের শাস্ত্রেও বলে —শেষ বয়সে সব বিষয় সম্পত্তির ওপোর মায়া মমতা কাটিয়ে তাকে ডাকো। শুধু, ভগবানকে ডাকো।

তা ডাকতে আর সাধ যায় না কার। নীরজাসুন্দরীও ডাকতেই চান। এ তো হলো গিয়ে মানুষের পরকালের কাজ। সংসার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, শুধু ভগবানের ধ্যান নিয়ে পড়ে থাকতে তাঁরই কি সাধটা কম? কিন্তু অনুপায় তিনি। জামাইকে ডেকেডুকে সম্পত্তির লেখাজোখা মেয়ের নামে করে দিয়ে তবে তো শান্তি। সেই কথাটাই ঈশানকে বললেন নীরজাসুন্দরী, বললেন—জামাইকে তা হলে খবর লিখে দিই ঠাকুরপো, তারপর ওরা এসে যা খুশি করুক?

ঈশান বললো—দাও, তা তো দেবেই বউঠান। মেয়েকে দেবে না তো কাকে

দেবে? কিন্তু তারা রইলো গিয়ে সে মুল্লুকে। কলকাতা কি আর কাছের পথ নাকি, যে মাঝেমধ্যে এসে দেখাশুনা করে যাবে?

—তাও বটে, সায় দিলেন নীরজাসুন্দরী। না হয় বেঁচেবর্তে দিয়ে ওদেরটা ওরা নিয়ে থুয়ে যাক।

—সেও ভালোই। কিন্তু সব দিক বিচার বিবেচনা করে যাহোক করো। দাদা আজ নেই বলেই কথাগুলো আমাকে বলতে হ'চ্ছে বউঠান। তা নইলে তোমার জিনিস তুমি যা খুশি করবে তাতে আমার কথা বলবারই বা কি অধিকার? কিন্তু এখন ভাল কথাটা বলা, ভাল পথ দেখানো আমার কর্তব্য। তা নইলে পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে। তাই বলছিলাম—মেয়ের বাড়ি তো আর ওঠা চলেনা তোমার। কথায় বলে বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরাও পর। দুদিন না হয় সইলই মেয়ে-জামাই। কিন্তু হঠাৎ একটা দুটো বেফাঁস কথা যদি বলেই ফেলে, তুমি কি সইতে পারবে? না, স্বর্গ থেকে দাদা তোমায় আশীর্বাদ করবেন? আর আমরা থাকতে তুমি মেয়েব বাড়ি উঠবে, তাইবা হ'তে দেবো কেন আমরা?

ঈশানের কথা শুনে আর এক চিন্তায় পড়লেন নীরজাসুন্দরী। সত্যিই তো, মেয়েব বাড়ি জামাইয়ের গলগ্রহ হ'য়ে তিনিই বা থাকতে যাবেন কোন দুঃখে? এ এক মহা সমস্যা। সেই সমস্যার মধ্যে পথ খুঁজে না পেয়ে বললেন —হ্যাঁ, তুমি যখন রয়েছোই, কিসে কি করলে ভাল হয় করো, বুদ্ধি টুদ্ধি দাও।

—নিশ্চয়ই, আমরাই কি কেলনা তোমার? না, তোমাকেই আমরা ফেলে দিতে পারবো কোনদিন? আমাদের তো ছেলেপুলে নেই। সংসারে আপন লোক বলতেও ওই তুমিই। এই যে আশ্রয় দিয়েছো, আপন না হ'লে কি দিতে? তাই বলি বউঠান, যার নুন খাই তার গুণ গাই।

অনেক ভেবেচিন্তে দিন সাতেক পরে নীরজাসুন্দরী ঈশানকে ডেকে বললেন—আর তো আমার মন মানেনা ঠাকুরপো। ক দিন বাঁচি তার ঠিক নাই। একটা তীর্থে থে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো স্থির করেছি।

—বেশ তো, এ তো সুবুদ্ধির কথা বউঠান। ঈশান চন্দ হেসে বললো —যাও, চলে যাও, মন যখন চায় তখন আর কি? শাস্ত্রে বলে, আত্মাকে কষ্ট দিলে তুষ্ট হয় না ভগবান। যাবে যখন তখন চলে যাও।

—সেই কথাই ভাবছি ঠাকুরপো। তিনি ডাকছেন আমাকে। কিন্তু জমি জায়গাগুলোর একটা ব্যবস্থা…

—নিশ্চয়ই। সেও করে যেতে হবে বইকি। কিন্তু তুমি চলে যাবে বউঠান, মন যে কিছুতেই মানে না। তাই বলে তোমাকে বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পাপের ভাগীও হওয়া যায় না। কথা শেষ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো ঈশান। তারপর এক সময় বললো—সবই দয়াময়ের করুণা। তা জমি জায়গার যা করতে চাও, করো।

—হ্যাঁ, নীরজাসুন্দরী বললেন—বিক্রিকিক্রি করে দিয়ে যদি—

—সেও করতে পারো। তবে কথা কি জানো বউঠান? তীর্থ করতে যাবে দাদার হাতের জিনিস খুইয়ে, তা স্বর্গ থেকে তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন, সে তীর্থের ফল কি? দাদার আত্মাকে কষ্ট দিয়ে তুমিই কি শান্তি পাবে নাকি? কত সাধ করেই না এসব করেছিলেন দাদা। দুঃখ হয় বাঁচলেন না বলে।

নীরজাসুন্দরী বললেন—কিন্তু আমার মন যে বাঁধন মানছে না ঠাকুরপো।

—থাকতে বলে পাপের ভাগী আমি কেন হতে যাবো? তবে যাবে যখন একটা মিছিল টিছিল করে, তবে যাও।

কদিন পরে আর এক চিন্তায় পড়লেন নীরজাসুন্দরী। তীর্থধর্ম করার এইতো বয়স। কিন্তু না দেখতে পাচ্ছেন সংসার থেকে তাঁর নিষ্কৃতি পাওয়াই কঠিন। অবশেষে বুদ্ধি চাইলেন ঈশানের কাছে।

ঈশান বললো—একেবারে না ছাড়িয়ে রেখে যাও। আমিই না হয় দেখাশুনা করবো। কি আর করি বলো, আমারই মন চায় নাকি সংসারে থাকতে কিন্তু উপায় নেই। তা ছাড়া তোমার জন্যে না হয় আটকেই রইলাম। তোমার আশীর্বাদেও সংসার হবে আমার।

শেষকালে অনেক বুদ্ধিপরামর্শের পর সব সম্পত্তি লিখে দিলেন নীরজাসুন্দরী। ঈশান চন্দ্রকেই লিখে দিলেন। কর্তার আত্মা শান্তি পেলো, জিনিসের জিনিস রইলো, আর তীর্থে থাকার ব্যবস্থাটাও পাকা হলো। এবার থেকে ঈশানই মাসে মাসে খরচ পাঠাবে নীরজাসুন্দরীকে। কাশী গিয়ে থাকাই সাব্যস্ত করলেন নীরজাসুন্দরী। কিন্তু তখন কি ছাই জানতেন যে এমন করে বেইমানী করবে ঈশান আর মনোরমা?

তিনমাস যায়, ছ' মাসও গেলো। ওমা! তীর্থে পাঠাবার আর নাম করে না ঈশান। কতদিন বলেবলে হয়রাণ হলেন নীরজাসুন্দরী। শেষকালে ওই মনোরমা, যা খুশি তাই বলে গালাগাল করতো তাঁকে। ঈশান বলতো—

ও সব ছাড়ো বউঠান, ছাড়ো। এই যে তুমি ক্ষেপে উঠেছো, বলি কাশী-বৃন্দাবন কি একটা ভাল জায়গা নাকি? কত যে পাপের জায়গা সে আমরা বুঝেছি। তার চেয়ে এই ভালো। এখানে থাকো। পূজো-আর্চা করো।

শেষকালে কিইনা না করলে ওরা। নীরজাসুন্দরীর বাড়িতে বসে তাকেই অপমান। ঈশান আর মনোরমা বলে কিনা—দুবেলা দুমুঠো খেতে পারছো, এই তো বেশি। আবার কট-কটানি কেন? সে সব আমরা সইবো না।

ওমা! কথা শুনে লজ্জায় মরেন। বুড়োকালে এতও সইতে হলো! কান্নাকাটি করলেন, শাপ-শাপান্ত। তারপর গ্রামের সব মুরুব্বি-মাতব্বরদের ডাকলেন। সকলেই এলো বটে কিন্তু ওই এক কথা সকলের মুখে। বলে কিনা, তোমার অধিকার কিছু নেই।

সেই যে শত্রু বিশে, তার বড় ভাইটা এখন দিব্যি বিয়েসাদি করে মোড়ল হয়ে বসেছে গ্রামের। জমিদারের নায়েব হয়েছে এখন সে। জমিদারণী বছর তিনেক ছিলেন গ্রামে বিশু চলে যাবার পর। তারপর কাশীতে চলে গেলেন। সেখানেই নাকি আছেন এখন। আর বিশের বড ভাইটা এখন নায়েব হয়েছে। অবস্থা ফিরিয়েছে। কিন্তু তাই বলে, লোক চিনতে আর বাকী নেই নীরজাসুন্দরীর। সেই যে বিশের মা, ছেলে চলে যাবার পর কত কান্নাকাটি, আসলে নীরজাসুন্দরী বুঝতে পেরেছিলেন—সে মাগীটাও কম খুশি হয়নি বিশে চলে যাবার পর। নিজে যখন পারলো না পালতে, অন্যে পালবে, মানুষ করবে—এটাও সহ্য হচ্ছিলো না শৈলবালার। সেই কারনেই খুশি হয়েছিলো মেয়েমানুষটা। তা বেশি দিন বাঁচলো না এই যা দুঃখ। দুটো ছেলের বিয়ে দিলো, বড় ছেলের ঘরের নাতির মুখ দেখলো, তারপর গত হয়েছে।

ঈশান গ্রামের সকলকে হাত করে উইল, করার নামে কি সব লেখাপড়ি সই-সাবুদ করিয়ে পুরো সম্পত্তিটাই নিয়ে নিলো। শেষকালে ওদের অত্যাচারের জ্বালায় মেয়ে-জামাইকে লিখলেন নীরজাসুন্দরী। জামাই লিখলো—"ও সব ঝামেলা করে লাভ কি, তার চেয়ে বরং চলে আসুন আপনি। ভগবান আমাকে যা দিয়েছেন তাতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। ও সব কাড়াকাড়ি করে লাভ নেই। যা যাবার গেছে, দুঃখ করবেন না।"

সেই চলে এলেন নীরজাসুন্দরী। তবে তিনিও কম যান না। গাঁয়ের সব

লোক জড় করে কেঁদে-কেটে শাপ-শাপান্ত করে চলে এসেছেন। তা ওদের কি ভালো হবে নাকি? ভগবানই বিচার করবেন, এইটুকুই আজ সান্ত্বনা নীরজাসুন্দরীর।

মেয়েকে উদ্দেশ্য করে নীরজাসুন্দরী বললেন—তা ছেলেটাকে মানা করবি তো খেলতে? বেলা পড়ে এলো সে দিকে তাকিয়ে দেখ?

—হ্যাঁ, এইবার যাবে, হাতের কাজে চোখ রেখেই যমুনা বললো। তারপর মুখ তুলে নীরজাসুন্দরীর দিকে তাকিয়ে বললো- যে দুষ্টু নাতি তোমার, কথা বললেই কি শোনে নাকি? ঘাড়ের রগগুলোই ওর তেড়া।

--ছি! ছি! ও কথা বলিস না যমুনা, বলতে নেই। সাঁঝ-সন্ধ্যেয় ওকি কথা? একটা মাত্তর ছেলে, তা মানিয়ে নিতে হয় বই কি। আর হবে নাই বা কেন? মায়ের চেলা তো। তোকে তো বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম। মানতের পূজো না দিলে কি শোধরাবে নাকি ওই ছেলে? যে সে দেবতা তো আর নয়, যাকে বলে কালীঘাটের মা।

—তোমার ওই এক কথা, যমুনা বললো, আমি গর-রাজি হ'য়েছি নাকি? তোমার জামাই-ই যে সময় করে উঠতে পারছে না।

আজ তিন মাস ধরেই এক বাই চেপেছে নীরজাসুন্দরীর মাথায়। নাতি যখন হলো, তখন ওই মায়ের নামে হত্যে দিয়েই অত সহজে হয়েছে। নিজের যতটুকু সাধ্য তিনি করেছেন। বুড়ো শিবতলার মানতও দেওয়া হয়েছে। শুধু বাকি রয়েছে কালীঘাটের এই মায়ের পূজো। তা তিনমাস ধরে বলে বলে হয়রাণ হয়েছেন তিনি। কেউ গা করে না।

দেবতা নিয়ে কি আর ছেলেমানুষী চলে? কিন্তু কে বুঝবে সে কথা! জামাইকেও বলেছিলেন। তা বিপদটা কি আর কম? তারও দোকান ফেলে নড়বার উপায়টি নেই। তবে জামাই কথা দিয়েছে, সে নিয়ে যাবে।

আর নীরজাসুন্দরী দেখছেন ওই মেয়েকে। যমুনাটা এমন হয়েছে, মোটে ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি নেই। ইচ্ছা করলে ওকি যেতে পারে না মাকে সঙ্গে করে? ঘুরে দেখেও আসতে পারে, সেই সঙ্গে পুণ্যও হয়। না, সেদিকে মেয়ের মন নেই। নীরজাসুন্দরী কি আর বোঝেন না কিছুই? সব বোঝেন।

এই করে করে মাথার চুল পাকলো, তিনকাল গেলো। আসলে মেয়েটার মন থেকে তুঃখটা আজও মুছে যায়নি। কাজকর্ম করে, স্বামীপুত্র দেখাশোনা করে বটে কিন্তু থেকে থেকে কেমন যেন হয়ে যায় যমুনা। তাও ভাবেন তিনি। নীরজাসুন্দরী নিজেই কি একেবারে ভুলতে পেরেছেন নাকি ছোঁড়াটার কথা? পেটের ছেলে না হোক, কমটা কিসে? তবু এখন আর সে শত্তুরের চেহারাটা ভালো ক'রে মনে পড়ে না! একটা সূক্ষ্ম বেদনাই শুধু করুণ রাগে বাজে বুকটার মধ্যে। তা গঙ্গায় স্নান করে পূজোটুজো দিয়ে একবার পরিষ্কার হ'তে পারলে, সব সাফসুফ হ'য়ে যাবে আপনা থেকেই।

তারপর প্রায় বছর ঘুরে এলো। নতুন বাড়ি শেষ হলো। গৃহপ্রবেশ সেরে সকলেই উঠে আসা হোলো নতুন বাড়িতে। কিন্তু এবার আর ছাড়ছেন না নীরজাসুন্দরী। কদিন বলতে বলল—বলো তোমার জামাইকে, দেখ কি বলে।

শেষকালে আবার জামাইকে ধরলেন নীরজাসুন্দরী, বললেন—দেখ বাবা, হাজার হ'লেও ঠাকুর দেবতার মানত। না দিলে যে পাপ হবে?

গুনীন বললো—আপনার মেয়ে কি বলে? তাকে বলুন না।

এই এক জ্বালায় পড়েছেন নীরজাসুন্দরী। একে বলেন তো ওকে দেখায়, আর ওকে বলেন তো সে একে দেখায়। নীরজাসুন্দরী বললেন—যমুনাকে বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেছি আমি।

একটু হেসে গুনীন বললো—একটু চেপেচুপে ধরুন, ঠিক হয়ে যাবে।

কী আর চেপে ধরবেন। ধরার কি কিছু কম করেছেন নাকি তিনি? তাঁর আর কি, পাপ হ'লে ওদেরই হবে। না হয় রাজি হ'লে একবার পুণ্য করে আসতে পারতেন তিনি। কর্তা বেঁচে থাকতেও তো ত-তুবার গিয়েছেন। আর একবার হ'লে মনটায় শান্তি হতো।

জামাইকে বললে সে অজুহাত দেখায়, বলে—তাইতো বড় মুস্কিল। দোকানের তুটো কর্মচারী ভেগেছে। এখন পূজোর সময় একজনকে ছাড়লেও দোকান চলে না। না হয় পূজোটা কেটেই যাক।

কিন্তু নীরজাসুন্দরী আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। এবার তিনি রেগে গেছেন। ভয়ঙ্কর চটে গেছেন। রেগেমেগে যমুনাকে বললেন—আমি না

হয় একলাই যাবো। বলি, এতকাল কি আর চলে নি তোদের ছেড়ে? এমনই বরাত করেছি যে একটু পুণ্যি করতেও দ্বিবি নে তোরা? থাক, তোদের ভরসায় আর বসে থাকবো না আমি, এই শেষ কথা বলে দিলাম।

হেসে যমুনা বললো—এই বুড়ো বয়সে একলা যাবে?

—যাবো না? একশোবার যাবো। বলি দো'কলাটা পাবো কোথায় শুনি? আমি কি আর যাই নি? না, চিনি না মায়ের থানের পথ?

—গেছ তো বাবার সঙ্গে সেই কোন্‌কালে যমুনা বললো, তখন একলা যেতে, বুঝতাম।

—কেন, তখন একলা যাবো কোন দুঃখে? রাগে-অভিমানে প্রায় ফুঁসে উঠলেন নীরজাসুন্দরী—সেই তো, সেই থেকেই কপাল পুড়েছে আমার। কর্তাও গেলেন, আমারও সব সাধ ঘুচলো। তিনি থাকলে কি আর খোসামোদ করতাম তোদের?

এবার নীরজাসুন্দরীর চোখে জলের আভাষ। পারলে মাথা কুটে কান্নাকাটি জুড়ে দিতেন তিনি। কিন্তু তা আর করলেন না। কেমন যেন বাধবাধ লাগলো তাঁর।

আর না পেরে সেদিন রাত্রিতেই যমুনা গুনীনকে বললো—মা তো ক্ষেপে উঠেছেন গো, তা একটা ব্যবস্থা-টাবস্থা কর?

—কিসের?

—কালীঘাটে যাবে গো! নাতির মানত মানত করে মাথা খেয়ে ফেলছে আমার।

—কিন্তু আমি কি করি বলতো? গুনীন বললো—দোকানে লোক মাত্র একজন। এ সময় কি দোকান ফেলে নড়বার জো আছে?

—তা ঠিক, কিন্তু মা বলছে একলাই যাবে।

—সে কি! বুড়োমানুষ একলা যেতে পারবেন কেন?

—গো যখন ধরেছে উপায় কী? গো তো তাঁর চিরকালের। বাবা পর্যন্ত নাস্তানাবুদ হয়েছে কতবার। আমি বলি কি যেতে চাচ্ছে যখন, যাক। সঙ্গে পুতলা না হয় যাবে। কালীঘাট তো জানাচেনাই মা-র। এখান থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দেবে, নম্বর বলে দেবে বাসের, ব্যস্‌, চলে যাবে।

গুনীন বললো—দাঁড়াও দাঁড়াও, কোলকাতা পর্যন্ত যাবার একটা লোক যদি পাই, নিশ্চিন্তে কলকাতা অবধি যেতে পারবেন।

নয়

বাসটা স্টপেজে থামতেই ছুটোপুটি লেগে গেলো যেন। অধিকাংশ যাত্রীই ক্ষেপে উঠলো নামবার জন্য। মহিলা আসনে বসে ভিড়ের জন্য নামবার সুযোগ পাচ্ছেননা নীরজাসুন্দরী। উল্টো দিকে বসেছিলো কমল, ভিড়ের জন্য তাকেও দেখা যাচ্ছে না। সেই ভিড়ের ভেতর হারা-উদ্দেশ্যে নীরজাসুন্দরী ডাকলেন—কমল, অই কম্‌লা।

—এখানে দিমা, ভিড়ের ভেতর থেকে উত্তর এলো।

প্রাণটা যেন হাতে পেলেন নীরজাসুন্দরী। এতক্ষণ কেমন ভয়ভয় করছিলো। কমলটা আবার আগে নেমে না পড়ে। আসতে দিতেই চাইছিলো না যমুনা, অনেক বলেকয়ে তবে সঙ্গে এনেছেন। যমুনা অবশ্য আসবার আগেই সাবধান করে দিয়ে বলেছে—কলকাতার রাস্তায় অনেক গাড়ি-ঘোড়া, অনেক রকমের লোকও আছে। ওর বয়স কম, একটু দেখেশুনে ওকে সঙ্গে সঙ্গে রেখো মা।

তা আর রাখবেন না নীরজাসুন্দরী? নাতি বলো আর নাতনী বলো, সবেধন নীলমনি তো ওই একটি মাত্র সলতে কমল। ছায়ার মত ঘিরে রাখবেন ওকে। মেয়ের কথার উত্তরে বললেন—রাখবো বই কি মা, নিশ্চয়ই রাখবো। তারপর একটু রসিকতা করতেও ছাড়লেন না, বললেন—ভয় নেইরে, ভয় নেই। দাঁতপড়া বুড়ি হলে কি হবে, তোর ছেলে আমাকে ছেড়ে আর কাউকে পছন্দ করবে না।

ভিড়টা একটু পাতলা হয়ে এলেই কমলের হাত ধরে বাস থেকে নেমে এলেন নীরজাসুন্দরী। নেমে হাঁপাতে লাগলেন। বাব্বা! এর নাম তীথ্‌থ করতে আসা! লোকগুলো যেন হা-পিত্যেস হয়ে এসেছে। যেন থান থেকে মা চলে যাচ্ছেন। আয়রে কম্‌লা—

রাস্তা পার হয়ে কালী-টেম্পল রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে আপন মনেই গজরাতে লাগলেন—কম ঝক্কি? রেলগাড়িতে ওই ভিড় তারপর বাস। কোলকাতার লোকগুলোর যেন তর সয় না। কার আগে কে যাবে। বাবা বাবা, তীথ্‌থ করতে এসেও শান্তি নেই।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কালীঘাটের এই এলাকাটা সরগরম হয়ে ওঠে।

কাছাকাছি ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি ঝুপসী বাড়ির সারি। সকাল বিকেল অসংখ্য, অগুন্তি লোকের চলাফেরা। ভিড় যেন লেগেই আছে। দুপুরের খর-রৌদ্রের তাপে একটু কমে আসে। ফুটপাতের অসংখ্য দোকানগুলোর কিছু কিছু উঠে যায়, একমাত্র নেমে আসে লোকের কলগুঞ্জন। আবার চারটা বাজতে না বাজতেই রোদটা একটু পড়ে এলে ফুটপাতের ওপরে সারি সারি দোকান বসে যায়।

সকাল বেলাবেলাতেও ঠিক একই রকম। দোকানীগুলো যেন ওৎ পেতে থাকে সারারাত। কখন একটু ফর্সা হয়ে আসবে রাতটা, কার আগে কে দোকান খুলে বসবে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে, কখনও বা একক যাত্রীদল আসবে। ভিড় করে এগিয়ে চলবে সামনে, কালীঘাটের মায়ের মন্দিরের দিকে। এরা পুণ্যার্থীর দল।

মন্দিরের কাছাকাছি আশেপাশে ছোটবড় অনেক মিষ্টির দোকান। এখানে এলে পূজোর জন্য ডালা চাইলেই পাওয়া যাবে। পাঁচ পয়সা থেকে ওপোরে মত খুশি। দরকার মত এখানে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরও অভাব নেই।

কমল হাত ধরে চলতে চায় না। তার ধারণা এখন সে ছোট কোথায়? কলকাতার রাস্তা বলেই কি ভয় করবে? একপা, দুপা করে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলো কমল।

—অই, অই কম্‌লা, অত ছুটছিস ক্যান রে? পেছন থেকে হাঁক দিলেন নীরজাসুন্দরী।

—আসো না। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কমল বললো, পা চালাও।

হুঃ! রাজপুত্তুরের ব্যাটা আমার ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন যেন! গর্জে উঠলেন নীরজাসুন্দরী—তোর মা তোকে বারণ করে দেয়নি?

—দিক. রাগ করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো কমল।

জ্বালায় পড়েছেন নীরজাসুন্দরী। আসবার সময় বার বার মানা করে দিয়েছে যমুনা। ছেলেটা কি কথা শোনে ছাই? তীর্থ করতে এসে কোথায় মাকে স্মরণ করতে করতে যাবেন, না এক জ্বালা জুটলো। এতকাল পরে মায়ের থানে আসা, তা উৎপাত দেখ। মোটে কথা শোনে না ছেলেটা।

আসি বললেই কি আসা যায়? দেশের সহায় সম্পদ হারিয়ে মেয়ের বাড়ি উঠেছেন নীরজাসুন্দরী। ছেলে বলো আর মেয়ে বলো, ওই একটা মাত্র সন্তান যমুনা। দেশে থাকতে বার দুয়েক মায়ের থানে এসেছিলেন নীরজাসুন্দরী।

তখন কর্তা বেঁচে। কত ঘটা করেই না, আসা হয়েছিলো। মন ভরে পুজো দিয়েছিলেন মায়ের। ইচ্ছামত সারাদিন মায়ের থানে কাটিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে দেশের পথে যাত্রা। সে দিনও নেই, সে কালও নেই। মেয়ের বাড়ি ওঠা অবধি আসি আসি করেও আসা হয় না। সাঁত্রাগাছি থেকে কালীঘাট আসা চাট্টিখানেক কথা তো আর নয়, পুরো কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা। সঙ্গে একজন লোকও চাই। বুড়ো হয়েছেন নীরজাসুন্দ, এখন আর একলা চলতে ফিরতে তেমন ভরসা পান না। জামাইয়েরও সময় নেই। কাজ ফেলে, দোকান ফেলে নড়বার জো-টি নেই বাছার। বাধ্য হয়ে শেষকালে কমলকে নিয়ে আসতে হলো। নইলে আর আসাও হয় না। অথচ কমলেরই মানতের পুজো, দেরি করবেন তাও সহ্য হয় না।

ততক্ষণে কমলকে ধরে ফেলেছেন নীরজাসুন্দরী। রাস্তার মাঝখান থেকে কমলের হাত ধরে ফুটপাতে উঠেছেন।

পাশেই সারি সারি কয়েকটা ফটো তোলার দোকান। একটা লোক এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো, বললো—তস্‌বীর খিচেগা মাঈজী?

বুঝতে না পেরে নীরজাসুন্দরী বললেন—কী বললি?

—তস্‌বীর। বাংলায় বোঝাতে চেষ্টা করলো লোকটি—ফোটো তোলেগা?

—আ-মর মুখপোড়া! ফট তোলার আর লোক পেলি না? খিঁচিয়ে উঠলেন নীরজাসুন্দরী।

—বহোৎ বানিয়া, আচ্ছা ফোটো হায় মাঈজী। দেড় রূপেয়ামে চার কপি। শেষ চেষ্টা করলো লোকটি।

—কোপি টোপির দরকার নেই, বললেন নীরজাসুন্দরী—বুড়ো হয়েছি, তিনকাল গিয়ে এক কাল আছে। এখন তুলবো ফট? বলি অই মুখপোড়া! বুদ্ধির মাথা কি খেয়েছিস্‌ হতচ্ছাড়া?

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটি। খরিদ্দারকে কায়দা করবার মত আর ভাষা খুঁজে পেলো না সে।

—আয়রে কমল! কমলের হাতে টান দিয়ে এগিয়ে চললেন নীরজাসুন্দরী। পোড়া কপালেরা চোখের মাথা খেয়েছে। বলে কিনা ফট, হুঃ।

রাস্তার পাশে অসংখ্য দোকান সারি সারি। রঙ্‌-বেরঙের কত পুতুল,

কত দেবদেবীর পট সাজানো রয়েছে। তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছা করে, কিছু একটা কিনে দেন কমলকে। কিন্তু সে জো কি রেখেছে যমুনা? কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে পয়সা দিয়েছে। তা থেকে একটা আধলা এদিক ওদিক করবার উপায় নেই।

আজও মনে আছে কর্তার সঙ্গে যখন এসেছিলেন এই মায়ের মন্দিরে, কত কি-ই না কিনেছিলেন। যমুনা তখন ছোট্টটি। পুতুল দেখে বায়না ধরে বসলো মেয়ে। সে কি বায়না? বাবা বাবা! একেবারে নাছোড়বান্দা মেয়ে। কি আর করেন কর্তা, শেষে বললেন—যা, যেটা খুশি বেছে নে।

মেয়েও কি কম বজ্জাত! একরাশ পুতুল বেছে বসলো। কর্তা বললেন—কোনটা নিবি?

একটাতে মন ওঠে না মেয়ের। বললো—সব চাই। তাই কিনে দিলেন কর্তা। সে এতগুলো পুতুল। কোলে কাঁকে জায়গা হয় না, শেষে পুঁটলীতে বাঁধতে হলো।

সারাদিন মায়ের থানে কাটিয়ে, পূজো দিয়ে, ভোগ পেয়ে তবে যাত্রা। ফেরবার পথে আর একগাদা জিনিস কিনে বসলেন কর্তা। ভাল দেখে কালীঘাটের মায়ের একখানি পট। বেশ বড়সড়। পটে মা যেন কত খুশি। তারপর নীরজাসুন্দরীর জন্য কাচের চুড়ি, একখানা আরশি, আরও কত কি। সব মনে নেই। সেই মায়ের পটখানা এখনও যত্ন ক'রে রেখেছেন নীরজাসুন্দরী। হাজার হলেও কর্তার হাতের স্মৃতি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে বামুনের দল। আসতেই আঁটালীর মত ধরে বসতে চায়, বলে—পূজো হবে মা? ভাল ডালা পাবেন।

বুজরুকি! এসব জানা আছে নীরজাসুন্দরীর। দু আনার ডালা দিয়ে দ' পাঁচ আনা আদায়? অত সোজা লোক নন নীরজাসুন্দরী। দু' দুবার এসেছেন গেছেন মায়ের থানে। কর্তার কাছে জেনে নিয়েছিলেন সব ফাঁকি ফক্কি। এক পয়সা দক্ষিণা দিয়ে চার আনা আদায়? অত সহজে চিড়ে ভিজবে না। নীরজাসুন্দরী বললেন—না গো বাছা, দরকার নেই।

দরকার নেই বললেই কি ছাড়ে এরা? পিছু পিছু আসে, কাকুতি মিনতি করে, অনুরোধ উপরোধের সীমা নেই। একটা লোক পেলে লাভটা কি কম? ডালার পয়সা, দোকানের কমিশন, মায়ের দক্ষিণার হেরফের, তা ছাড়া

নিজের বিদায় তো রয়েছেই। তাই, অত সহজে ছাড়লে চলবে কেন? চেষ্টার ত্রুটি রাখে না ওরা।

নীরজাসুন্দরীও সোজা লোক নন? এইটুকু পথ আসতেই পাঁচ পাঁচজন বামুনকে ছুটিয়ে দিয়েছেন। ঠিক মায়ের থানে 'ঢোকবার দরজায় অশ্বত্থ গাছটার নিচে আর একটি লোক এসে ধরলো—পুজো হবে মা?

—না বাছা, দর্শন করতে এলাম।

—করুন, দর্শন করুন। মাকেও কিছু দিয়ে যান? পরকালের কাজ তো এইটুকুই, সঙ্গেও যাবে এই। ইচ্ছা থাকলে মায়ের থানে মিথ্যা বলবেন না।

চমকে উঠলেন নীরজাসুন্দরী। ভারি ভদ্রলোক তো বামুনটা। একেবারে হক কথাটাই বলেছে। চোখ তুলে লোকটার দিকে তাকালেন তিনি।

একমুখ খোঁচাখোঁচা দাড়ি। ধবধবে সুদীর্ঘ দেহ। পরনের ধুতির প্রান্ত আড়াআড়ি করে বুকের ওপোর রাখা। চেনাচেনা মনে হ'চ্ছে যেন। হঠাৎ নীরজাসুন্দরী বললেন—কে!

একটু হাসলো লোকটি, বললো—সেবক, মায়ের সেবক।

আবার চমকে উঠলেন নীরজাসুন্দরী। এ হাসিটা যেন তাঁর খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে! ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন লোকটাকে। অনেকক্ষণ। তারপর একঝলক বিস্ময় কণ্ঠ পেরিয়ে মত হলো —বিশ্বনাথ না?

বিশ্বনাথও চমকে উঠেছে ততক্ষণে। প্রথমবার চিনতে না পারলেও, ওই সম্বোধনের সূত্র ধরে সব কুজ্ঝটিকা সরে গেলো চোখের সমুখ থেকে। ওদের গাঁয়ের নীরজাবুড়ি। আজকের কথা কী? কিন্তু ঠিক চিনেছে বুড়ি। এতটুকু এদিক ওদিক হয় নি। এদিক ওদিক হবার কথাও নয়।

—ঠামা! বিস্ময়ে আৎকে উঠলো বিশ্বনাথ।

—হ্যাঁরে, ঠামা। কপালখাকী! চোখ দুটো মুছে নিলেন নীরজাসুন্দরী, বললেন—তুই এখানে!

—ভাগ্য ঠামা, ভাগ্য। মায়ের শ্রীচরণে পড়ে আছি। তারপর প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য বললো—তা তুমি হঠাৎ মায়ের থানে! পুজো দেবে?

—তাই মনে করেই তো এলাম বাবা! কতদিন আসিনি, মনটা বড় আকুপাকু করে। সময় হয় না, বুঝলি বিশু? মায়ের ডাক না পড়লে কি মনিষ্যির সাধ্য আছেরে আসবার?

—তা ঠিক, তা ঠিক, সায় দিলো বিশ্বনাথ।

সায় দেবার ওপোর খুব একটা গুরুত্ব দিলেননা নীরজাসুন্দরী। বলেই চললেন তিনি—তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি, তীথ্থ-ধম্ম করার এই-ই তো সময়। কিন্তু ওই, ভাগ্যে নেই। তা নইলে অমন মহাদেবের মতন সোয়ামী অকালে চলে যাবে কোন দুঃখে? থানের আঁচল তুলে চোখের জল মুছে নিলেন নীরজাসুন্দরী।

সহ্য হচ্ছিলো না বিশ্বনাথের। এ প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে চলতে চায় সে। তাই বললো—তা ঠামা গঙ্গায স্নানটান করবে তো?

ততক্ষণে চোখমুছে আঁচল নামিযে নিযেছেন নীরজাসুন্দরী। বিশ্বনাথের কথার উত্তরে বললেন—গঙ্গাচ্চান তো করবই বাবা। সব পাপ ধুয়ে ফেলত হবে। কম পাপ কি করেছিরে বিশে? তা নইলে ঈশানটা আমার সব লুটেপুটে নিলো? শেষকালে মেযের ভাত কপালে লেখা ছিলো আমার। হায়রে কপাল। বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের কপালে নিজেই করাঘাত করলেন।

—সবই ভাগ্য ঠামা, বললো বিশ্বনাথ। ও সব আর মনে এনো না, এখন শুধু মাকে ডাকো। দুঃখ, তাপ সব তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করো।

আশ্চর্য দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরজাসুন্দরী। যেন অবাক হ'যে গেছেন। মায়ের শ্রীচরণে ঠাঁই পেযেছে বিশ্বনাথ। গোড়া থেকেই অবশ্য ছেলেটার ধর্মে মতি ছিলো। ছোটকালে সব সময় কেমন যেন মিইয়ে থাকতো। কেমন একটা মনমরা মনমরা ভাব ছিলো। কিন্তু রূপে এগুবে কে? সারা গাঁয়ে অমন সুন্দর দ্বিতীয় ছেলে ছিলো না। ধব্ধব্ করছে গায়ের রঙ। কী নাক। কী মুখ। যেন স্বর্গ থেকে নন্দগোপাল স্বয়ং নেমে এসেছেন।

বিশ্বনাথ বললো—তা ঠামা, গঙ্গায় ডুবটা সেরে আসবে চলো।

—যাবো বাবা, যাবো। বললেন নীরজাসুন্দরী, মায়ের থানে এলাম. একবার দর্শনটা করেই যাই। পরানটা ঠাণ্ডা হোক।

—সেই ভাল। তবে এসো। মন্দিরের দিকে এগুল বিশ্বনাথ।

পেছন পেছন এগুলেন নীরজাসুন্দরী, তার পিছে কমল। ছোঁড়াটা সেই থেকেই মোটে কাছে ঘেঁসছে না। না ধরছে হাত, না অন্যকিছু। যেতে যেতে বিশ্বনাথকে চেয়ে দেখছিলেন নীরজাসুন্দরী। ঠিক যেন সাধু মোহান্ত। অথচ ছেলেটা সংসার ধর্ম করলো না।

হঠাৎ নীরজাসুন্দরী ডাকলেন—হাঁারে বিশু ?

—ঠামা! চমকে উঠলো বিশ্বনাথ। ওর মনে সেই থেকেই একটা ভয় বার বার ছুলে দুলে উঠছে। কোন্ কথায়, কিসে আবার সেই পুরোনো কথা তুলবে বুড়ি। হয়তো ফিরিস্তি চাইবে, জনেতে চাইবে কোথায় কেমন করে ছিলো বিশ্বনাথ। এই সব।

বিশ্বনাথ বললো—কি ঠামা ?

—মায়ের পেসাদের একটু ব্যবস্থা করে দিবি বাবা ?

তাড়াতাড়ি বিশ্বনাথ বললো—সে ভেবো না ঠামা, সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

—দিস বাবা, দিস। পরকালের কাজ করবি। মায়ের চরণে ঠাঁই পেয়েছিস, কত পুণ্যই না করেছিলি রে।

শুনে হাসলো বিশ্বনাথ। হাসি পেলো ওর। বাইরে প্রকাশ না পেলেও মনে মনে হাসলো। মনে মনেই ভাবলো, সব পরকাল, সব তুষ্টি, সব ধর্ম ধুয়ে মুছে যাবে ঘরে ফিরে যাবার পর। মানুষ কষ্টে পড়েই না এমন কাজ করে। মণিকার সঙ্গে ও শেষ কপর্দক পর্যন্ত একদিন হারিয়েছিলো। তিনদিন তিনরাত শুধু হাঁটাপথে বিয়াল্লিশ মাইল পাড়ি দিয়ে কালীঘাট এসে পৌছেছিলো। পথে জোটেনি এক মুঠো খাবার। শুধু জল। জল খেয়ে কেটেছে ওর দিনগুলো। মণিকা সত্যি সত্যি ওকে পথে বসিয়েই চলে গিয়েছে। মণিকা গেছে যাক। অনেকেই তো এমনি চলে গেছে, সরে গেছে অথবা ও নিজেই সরে এসেছে। আজ তার জন্য কোন দুঃখ থাকবার কথা নয় বিশ্বনাথের মনে। এটাই ওর স্বভাব। কিন্তু মাঝে মাঝে তবুও ওর মধ্যে কি একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি খচ্ খচ্ করে বিঁধে। আহত হয় বিশ্বনাথ। সে অনুভূতি বুঝি বেদনার। সে বেদনার কেন্দ্র মণিকা নয়, গৌরী নয়, কল্যানীও নয়। সে কার জন্য, কিসের জন্য সে বেদনা ও নিজেই খুঁজে পায় না। হয়তো সমগ্র যমুনা, কল্যানী, গৌরী ও মণিকার বেদনা।

গঙ্গার ঘাটে চাতালের ওপর বসেছিলো বিশ্বনাথ। নীরজাবুড়ি স্নান করছেন। অনেক অনেক কথা মনে পড়ছে। যমুনার কথা। কিন্তু প্রায় যুগাবধি সে কথা স্মরণ করতে গিয়ে ভয় পেয়েছে। ও জানে, যখনি তার কথা ভাবতে বসবে, তখনি বুকটা টনটন করে উঠবে, বেদনায় আহত হ'য়ে

পড়ে থাকবে ও। সেই ভয়েই যমুনাকে কোনদিন ভাবতে চায়নি ও। কিন্তু আজ আর পারছে না। যমুনাকে আজ বড় বেশি করেই মনে পড়ছে। পনেরো বৎসরের সেই মেয়েটা কি ভালোই না বাসতো বিশ্বনাথকে! ছোট্ট বেলা থেকেই সেই বউবউ খেলা। খেলনা আর পুতুল নিয়ে ঘরকন্নার অভিনয়। সে সব ছবি এ দুটো পোড়া চোখের মণি থেকে আজও মুছে যায় নি। সূর্যকিরণের মতই জলজলে সেই স্মৃতি আজও অম্লান মহিমায় বেঁচে রয়েছে মনের মণিকোঠায়।

বেশ মনে পড়ছে যমুনার সেই ঢলঢলে মুখখানি। এখন কেমন আছে যমুনা? কোথায় আছে? তার কি মনে আছে বিশ্বনাথের কথা? একবারও কি বিশ্বনাথের কথা মনে করে যমুনার বুকটা তোলপাড় করে ওঠে না? তবে কেমন, কেমন করে ভালোবাসলো যমুনা? কোন মূল্যে?

কয়েকবার জিজ্ঞাসা করবে করবে ভেবেও চুপ করে গিয়েছে বিশ্বনাথ। মন শুনতে চাইছে। ওর যমুনার কথা শুনতে চাইছে। কিন্তু আপনা থেকেই কেন যেন মিইয়ে আসছে ও। কেমন একটা অহেতুক লজ্জা অথবা ভয়ে বারবার ম্রিয়মান হ'য়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, কে জানে, কি মনে করবে নীরজাবুড়ি। হয়তো পুরোনো সেই তিক্ত বিস্বাদ স্মৃতি রোমন্থন করবে আসল কথা ফেলে। আরও ভয় করছে ওর, কিসে কি শুনবে হঠাৎ বলা যায় না। হয়তো এমন কিছুও শুনতে পারে, যা নিজেও সহ্য করতে পারবে না। যে নীরজাবুড়ি বিশু বিশু বলে একদা অস্থির থাকতো, সেই উচ্ছ্বাস আজ কোথায়? সে ঠাম্মা কোথায়? যে তার মেয়েকে অনায়াসে ছেড়ে দিতে পেরেছিলো বিশ্বনাথের হাতে?

অথচ এই নীরজাবুড়ির কথাতেই একদিন গ্রাম ছেড়ে, সুখ-সমৃদ্ধি ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছিলো বিশ্বনাথ। আজ সে কথা ভাবতে বসে ওর হাসি পায়, লজ্জায় একটু যে রেঙে না ওঠে তা নয়। অপরিণত মনে কেমন কৌশলে আঘাতটা দিয়েছিলো নীরজাবুড়ি, আর নিজেও আগুপিছু চিন্তা-বিবেচনা না করে পথে বেরিয়ে পড়েছিলো। সেদিন ভাবে নি, ক্ষণিকের জন্য মনে এতটুকু চিন্তাও আসেনি—কোথায় দাঁড়াবে ও, কোথায় মিলবে এতটুকু ঠাই? সেদিন যদি মনে মনে আহত হ'য়ে ও না চলে আসতো, হয়তো সুখ-সমৃদ্ধিতে সংসার ভ'রে উঠতে পারতো ওর। কিন্তু নিজের ভুল, নিজের হঠকারিতার জন্যই ওকে আজ এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকতে হ'চ্ছে।

বাকসী থেকে পায়ে হেঁটে ও যখন কলকাতা এলো, মনে হলো সমস্ত কোলকাতাই যেন বিদ্রূপ করছে ওকে। কালীঘাটে এলো, এখানেও তাই। দীনু ওকে বসালো, বললো—ইয়ার, তোর চিন্তায় মাইরী চোখে ঘুম নেই আমার।

কথা বলেনি বিশ্বনাথ। চুপচাপ বসেই ছিলো ও। বসে বসে ভাবছিলো। এই ভালো। এই ওর ভাগ্য। ওরা যত যাই বলুক, মা সে, মা-ই। ভারতবর্ষের কোটি-কোটি মানুষ ধর্মকে বিশ্বাস করে। ধর্মই সত্য। পুণ্যই মানুষের জীবনের সব। তা না হ'লে ওর এমন হতো না। তৃষ্ণা থেকে যতদিন ও বিরত ছিলো কোন দুঃখ হয়নি ওর। আজ হ'চ্ছে। তাও ওর কর্মফল। সেদিন থেকে এই পথই বেছে নিয়েছে ও। বেছে নিয়েছে মায়ের সেবকের কাজ।

সেদিন ওর মনপ্রাণ ভরে উঠেছিলো কী এক অভূতপূর্ব আনন্দে। দীনুর কথা ও কানে তোলেনি। সমস্ত মন্দিরের বাইরে অনেকবার আপন মনে ঘুরলো বিশ্বনাথ। দুপুর গড়িয়ে গেলো। ভোগ হোল মায়ের। এতক্ষণ মন্দিরের বাঁ পাশের পুকুর ঘেঁসা রাস্তাটার ওপোর কতগুলো ভিখিরি ছেলে পেট ভরে মায়ের ভোগের প্রসাদ খাচ্ছিলো। বৃদ্ধ, বয়স্ক এবং অনেক ভিখারিণীও সে দলে। এই একটা আশ্চর্য জীবন ওদের। সারাদিন ওরা যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা ভিক্ষা করে। সকালে হয় তো দু এক পয়সার মুড়ি পেটে পড়ে কোনদিন, কোনোদিন তাও নয়। বলতে গেলে বিকেলের ভোগের প্রসাদই দিনের মধ্যে একমাত্র ভরসা ওদের। রাত্রিতে মন্দিরের আশেপাশেই পড়ে থাকে। বিকেলে যখন যাত্রীর সংখ্যা কমে আসে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-গুলো ছোট তাস নিয়ে খেলতে বসে যায়।

সারাদিন নতুন করে ঘুরেঘুরে কালীঘাট দেখলো বিশ্বনাথ। যতই ও ঘুরলো, ওর মনপ্রাণ কি এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে উঠলো।

রাত্রিতে আবার দীনুর দোকানে। দীনু অনেক বোঝালো বিশ্বনাথকে কিন্তু ও যেন স্থির প্রতিজ্ঞ। বিশ্বনাথ এমন হ'য়ে যাবে দীনুও আশা করে নি। শেষে যখন পারলো না আর, কথা হলো খাবেদাবে দীনুর এখানেই। দীনুর দোকানের বামুন হবে বিশ্বনাথ।

রাত্রিতে শুয়েশুয়ে অনেক আকাশ পাতাল ভাবলো বিশ্বনাথ। আসলে ও নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলো না কোন কারণে এমন করে সমস্ত ভবিষ্যত জলাঞ্জলি

দিয়ে এই কাজ করবে ও। কিন্তু উপায় নেই। কী করবে ও? ওযে সবস্ব খুঁইয়ে আজ নিঃস্ব পথের ভিখারী। কিছুই নেই ওর।

একটু ঘুমের আমেজ এসেছিলো বোধ হয়, ঠিক এমন সময় এলো নিবারণ চাটুজ্যে, ঢুকেই বললো—কই গো দীননাথ, সে চাঁদ কই?

দীনু বললো—শুয়ে পড়েছে।

—ধুত্তোরি তোর শোয়া। বলতে বলতে বিশ্বনাথের কাছে এলো নিবারণ, বললো—কিগো চাঁদবন্ধু, এত সকালে শয়নে?

—একটু ঘুমুতে দে, বিরক্ত হ'য়ে বললো বিশ্বনাথ।

—রেখে দে তোর ঘুম, ওঠ শালা। বলি, এতদিন সে মাগীটাকে নিয়ে কোথায় লুকিয়েছিলি?

—নিবা! প্রায় গর্জেই উঠলো বিশ্বনাথ। মুখ সামলে কথা বলিস।

মুহূর্তেই নিবারণ চাটুজ্যে ভ্যাবাচ্যাকা।

খানিকটা গম্ভীর হ'য়ে রইলো বিশ্বনাথ। তারপর বললো—ভদ্রলোকের মত কথা বলিস।

মণিকার অপমান সইতে পারে নি বিশ্বনাথ। ওর মনের দগদগে ঘা-তে এমন করে নিবারণ নুনের ছিটে দিলো যে, চটে না উঠে পারলো না।

কিন্তু নিবারণ সহজ হ'য়ে এলো তক্ষণি, বললো—রাগ করলি মাইরী? সত্যি, স্রেফ ঠাট্টা করেই বলেছিলাম। তা চ, ঘুরে আসি ও পাড়ায়।

ভুং করে শুয়ে বিশ্বনাথ বললো—না। দরকার থাকে যেতে পারিস তুই। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলছি, ওসব কখনও আমাকে বলবি না ভবিষ্যতে। বললে, গিলে খেয়ে ফেলবো শালা কাকের বাচ্চা।

নিবারণ আর কথা বলে নি বিশ্বনাথের সঙ্গে। একটু যেন আহত হ'য়েই নিবারণ কথা সুরু করলো দীনুর সঙ্গে, বললো—ও দীনুদা, এ যে দেখছি গোখরো সাপ হয়েছে গো! কোথায় ভাবলাম অনেক দিন পরে এলো, পাড়ায় গিয়ে একটু ফুর্তিফার্তি করবো, তা রকম দেখে মাইরী ভাল ঠেকছে না।

দীনু বললো—যা না, তুই যা।

—ধুত্তোরি। দু দিন যা কামিয়েছি, এক ফোঁটা পেটে পড়েনি। আজ বুঝলে দীনুদা, একেবারে, বলার সঙ্গে হাত মেলে পাঁচটা আঙুল দেখালো নিবারণ, বললো—ক্যাশ।

—পাঁচ টাকা!

—হ্যাঁ গো।

—কায়দা করলি কী করে? দীনু প্রশ্ন করলো।

ফিরিস্তি দিলো নিবারণ।

মায়ের আরতির সময় ভেতরটায় ভিড় একটু বেশি। সন্ধ্যেবেলার দিকে সব ভক্ত-ভগবানদের আনাগোনা। সেই ভিড়ের সুযোগে বেমালুম পকেট হাতড়ে নেট কামাই পাঁচ টাকা।

দীনু বললো—ছুঁচো কোথাকার, হাতাবি তো মোটা মাল দেখে। আবার গর্ব করছিস?

খেদ করে নিবারণ বললো—কী করি দাদা, দুদিনে কামিয়েছি দুটাকা। আজতো সেরেফ ফাঁকি। তাই দেখলাম এতেই আজ পাড়ার খরচাটা চলে যাবে। নইলে মশা মারে কোন শালায়? আরে দাদা, এই জন্যই তো পড়ে আছি। মায়ের সেবক, ধরে কোন শালায়? নইলে সেবারে—সেই যে মনে নেই—বাচ্চা মেয়েটার গলার হার?

—থাক থাক, খেঁকিয়ে উঠলো দীনু—ভাগ, ভাগ শালা জোচ্চোর।

দীনু না তাড়িয়ে পারেনি। এক্ষুণি কথাটা প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো। সেই বাচ্চা মেয়ের সোয়া ভরির সোনার হার কুড়ি টাকায় দীনুই কিনেছিলো নিবারণের কাছ থেকে।

কেন যেন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিলো বিশ্বনাথের মন। দিন ছয়েক পর থেকে আর দীনুর দোকানে খায়নি। যা কামাই হয়েছে, হোটেলে খেয়েছে। না হলে খায়নি। আজও সেই নিয়মই চলে আসছে। তবে দীনুর সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্কটা উঠে যায়নি আজও।

এই সুদীর্ঘ কটা বৎসরের ব্যবধানে তবুও যমুনাকে ভুলে যায়নি বিশ্বনাথ। মণিকা, কল্যাণী, গৌরী ওদের ভিড়ে যমুনা হারিয়ে যায়নি। আর যায়নি বলেই বুঝি আজ এমন করে এই গঙ্গার ঘাটের চাতালের ওপোর বসে তার মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ছে। যে মুখখানা অনেকবার স্মরণে পেয়েও ভুলতে চেয়েছে।

তখন একটা ভালো সম্বন্ধ পাকাকাকি হয়ে গেছে যমুনার। কিন্তু হলে কি হবে? ওইটুকু একরত্তি মেয়ে বেঁকে বসলো। সে বিয়ে করবে না। তাই

নীরজাবুড়ি স্মরণ করলেন বিশ্বনাথকে। আড়ালে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি বললেন—যমুনা তোর কথা শোনে বাবা, ওকে তুই একটু বল্।

—কি বলবো ?

নীরজাবুড়ি বললেন—সম্বন্ধটা পাকাপাকি হয়েছে কিন্তু মেয়েটা যে বেঁকে বসেছে বাবা। আজ দুদিন নিৰ্জ্জলা উপোষ।

—উপোষ! চমকে উঠলো বিশ্বনাথ।

—হঁ্যা। কান্নাকাটি করেকরে কিছু রাখছে না। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে নীরজাসুন্দরী বললেন—সবই বুঝি বাবা কিন্তু ওযে হবার নয়। মেয়ে যা বলছে, তা কি করে হয়? তারপর একটা মুহূর্তে বিশ্বনাথের হাতটা খপ্ করে ধরে প্রায় কেঁদেই ফেললেন নীরজাসুন্দরী—তুই এখানে থাকলে কিছুতেই ও মেয়ের বিয়ে হবে না। তুই ওকে মুক্তি দে বিশু, নিষ্কৃতি দে। আমার বংশের মানরক্ষা কর বাবা।

নীরজাসুন্দরীর মানরক্ষা করেছিলে বিশ্বনাথ। দু দিনের অভুক্ত যমুনার শয্যাপার্শ্বে এসে বসলো। ওর কোলে মাথা রেখে যমুনার সে কী কান্না! মাথায় আস্তে হাত বুলিয়ে যমুনাকে সান্ত্বনা দিলো বিশ্বনাথ, বললো—অভিমান করো না, এমন ভাল ঘর বর মেলে না মেয়েদের।

গর্জেই উঠেছিলো যমুনা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর মত ফনা তুলে। কিন্তু বিশ্বনাথের চোখে চোখ পড়তেই কেমন যেন নিবিষ হয়ে এলো, বললো—বিয়ে বসতে বলছো।

–হঁ্যা। আস্তে করে বললো বিশ্বনাথ।

—তুমি—ফোলাফোলা ডাগর চোখদুটো বিস্ফারিত করলো যমুনা, বললো—তা হলে কেন রয়েছ চোখের সামনে ?

মাথা নিচু করলো বিশ্বনাথ। ও যেন আর তাকাতে পারছিলো না।

যমুনা ফুঁসে উঠলেও, কেমন যেন মায়া হলো বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে। ফোলাফোলা ভেজা-চোখের পাতা মেলে ড্যাবড্যাব করে তাকালো ও। থরথর করে কাঁপছে ওর ঠোঁট দুটো। শুধু একটা কথাই বললো যমুনা—কিন্তু, কিন্তু তোমার পুতুল ?

পুতুল। আর বসতে পারেনি বিশ্বনাথ। যেন এক ঝলক আগুনের তপ্ত স্পর্শ লাগলো ওর বুকে। ছুটে বেরিয়ে এলো ও।

ততক্ষণে স্নান সেরে উঠে এসেছেন নীরজাসুন্দরী। স্নান করতে গিয়ে অনেক কথাই ভাবলেন তিনি। ভাবলেন যমুনার কথাটা বলবেন। কিন্তু আবার মনে হলো—না, বলবেন না। কোথায় যেন বলা না-বলার একটা সংশয় মৃদুতালে দুলছে মনের মধ্যে।

মায়ের মন্দিরের দিকে এগুতে এগুতে নীরজাসুন্দরী ডাকলেন—হ্যাঁ বাবা বিশু, চৌধুরীদের অত বিষয় সম্পত্তি তুই-ই তো পেতিস। সব ছেড়ে এলি? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি বাবা?

হাসলো বিশ্বনাথ, বললো—না ঠামা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিনি। আমার লক্ষ্মী ঠিকই আছে। শুধু পরের লক্ষ্মীকে সরিয়ে দিয়েছি। ওযে আমার নয় ঠামা, পরের। আমার কপালে সইবে কেন?

অবাক হয়ে গেলেন নীরজাসুন্দরী। প্রকৃত সাধুর মতই কথা বলছে বিশ্বনাথ। আর বলবেনা-ই বা কেন? গোড়া থেকেই যে ছেলেটার ধর্মে-কর্মে মতি। তা নইলে কি আজও বিয়ে হতো যমুনার?

সেই কথাই ভাবেন নীরজাসুন্দরী। পনোরো বছরের ওইটুকু মেয়ে সে কী-ই-বা বোঝে বিয়ের? কিন্তু সত্যি সত্যিই বেঁকে বসলো যমুনা। সম্বন্ধ তখন গুনীনের সঙ্গে পাকাপাকি। কিন্তু মেয়ের গো, বিশ্বনাথকে ছেড়ে আর কাউকে বিয়ে করবে না। কথা শুনে ভয়েই মরেন নীরজাসুন্দরী। একে জমিদারের দত্তক, তায় বামুনের ছেলে। এ কথা রটলে কি আর উপায় আছে? তাই অনেক সান্ত্বনা দিয়ে মেয়েকে বোঝালেন, বললেন—তা হয় নারে মা, হয় না। বামুনের ছেলের সঙ্গে কায়েতের বিয়ে হয় না।

শুনে থমকে খানিক দাঁড়িয়ে রইলো যমুনা। বললো—আগে বলোনি কেন এসব কথা?

কথা শুনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। কি বলেই বা বোঝাবেন ওইটুকু মেয়েকে। যত কথা বলছে, কাঁদছে তার একশো গুণ বেশি। বললেই কি বুঝবে নাকি?

যমুনা কেঁদে কেঁদে বললো—না-না, কোনদিন আমি বিয়ে করবো না, কাউকে না। সঙ্গেসঙ্গেই ছুটে বেরিয়ে গেলো ও হাউহাউ করে কেঁদে উঠে।

অবাক হয়ে সেইদিনই দেখলেন নীরজাসুন্দরী। পনেরো বছরের ওইটুকু মেয়ে খেলাখেলা নিছক অভিনয়কে কতখানি বিশ্বাস করেছে। হাড়েহাড়ে বুদ্ধি গজিয়েছে ওর। সেই থেকেই গো চাপলো। খায় না, দায় না—শুধুই

কান্না আর কান্না। কী আর করেন নীরজাসুন্দরী, শেষকালে গিয়ে ধরলেন বিশ্বনাথকে। না হলে এমন সম্বন্ধটা ভেঙে যায়। যমুনা কথা শুনতো ছোঁড়াটার, তাই না যাওয়া। কিন্তু কিসে কি কথা বলেছিলেন, অমনি দেশ ছেড়ে উধাও হয়ে গেলো বিশ্বনাথ! কদিন কী কান্নাটাই না কাঁদলো যমুনা! সে মেয়ে নিয়েও কি কম বিপদ! ছোঁড়াটা গিয়েও শান্তি নেই। মেয়ে যেন পাগল হয়ে গেছে।

বেলা বাড়লো ক্রমশঃ। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি বিশ্বনাথের। প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেটের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। কী করেই বা খাবে? সকাল থেকে কামাই হয়নি আধ পয়সার, লোক ধরতে পারলোনা একটা। যাও জুটলো, সে হাড়কিপ্টে নীরজাসুন্দরী। আগের দিনের জমানো পয়সা কিছু আছে কিন্তু সঞ্চয় থেকে আধ পয়সা ভাঙতেও মন চায় না। একবার হাত পড়লে হু হু করে খরচ হয়ে যাবে সব।

মন্দিরের মুখোমুখি এসে বিশ্বনাথ বললো—পুজো দেবে তো ঠামা?

-তা দেবো বই কি বাবা, মানতের পূজা না দিলে যে পাপ হবে রে। এক টাকা স-পাঁচ আনার মানত। বলতে বলতে সযত্নে আঁচলের গিঁট খুললেন, বললেন— কত লাগবে বিশু?

সে তোমার খুশি ঠামা। মানতের পুজো যখন, একটু ভালো করেই না হয় দাও। মা খুশি হবেন, মনেও শান্তি পাবে। সহজে তো আসা হয় না, তাই বলছিলাম।

—ঠিক, ঠিক বলেছিস্ বিশু, বললেন নীরজাসুন্দরী। আবার কবে মায়ের ডাক পড়ে, কে জানে? সন্তর্পণে আঁচলের গিঁট খুলে পুরো দুটো টাকাই তুলো দিলেন বিশ্বনাথের হাতে, বললেন—একটু পেসাদের ব্যবস্থা করে দিস বাবা!

মনেমনে হাসলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করলো না বিশ্বনাথ, বললো—তা আর দেবো না ঠামা? এতকাল পরে এসেছ মায়ের থানে, তা তুমি এখানে বসো, আমি সব ব্যবস্থা করে আসি।

দীনুর দোকান থেকেই বরাবর ডালা কেনে বিশ্বনাথ। দীনুর সঙ্গে এটুকু যোগাযোগ ও রেখেছে। কমিশনটা ভালো দেয় দীনু। তা ছাড়া ভেজাল

দেওয়া জিনিস অল্প পয়সায় পাওয়াও যায় অনেক। অর্ধেক পয়সা এখানেই লাভ করা যায়। সেই কারণেই দীনুর সঙ্গে সংযোগটা পুরোপুরি রয়েছে এখনও।

ভাঙা কাচের তালিমারা বাক্সের ওপাশে বসে নোংরা গামছা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিলো দীনু। বিশ্বনাথকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো—বলি, এই যে শালা বামুনের পো। আজকাল এদিক ওদিক করিস নাকি র‍্যা?

—আরে না না, বাধা দিলো বিশ্বনাথ, তোকে ছেড়ে যাবো কোথায়?

—সেই কথাই তো ভাবছি রে! একেবারে সকাল থেকেই পাত্তা নেই! পানের ছোপ-রঙা দাঁতের পাটি বের করে হাসলো দীনু, বললো—তা, সকাল থেকে ধরলি কটা?

—সে গুড়ে বালি, হাসলো বিশ্বনাথ, সবে একটা, তায় আবার কিপ্টে বুড়ি?

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো দীনু—শেষকালে বুড়ি, তায় আবার কেপ্পণ? তোর মাইরী একেবারে বরাত খারাপ। অমন রূপ থাকলে শালা মার্কেট কামাল করে ছাড়তাম।

ফিরে এসে ডালাটা নীরজাসুন্দরীর হাতে দিয়ে বিশ্বনাথ বললো—নাও ঠাম্মা, জিনিসপত্র একেবারে আগুনের দাম।

ফুল বেলপাতা নিঙড়ানো পাদোদক খেয়ে, কপালে চোখে লাগিয়ে নীরজাসুন্দরী উত্তর দিলেন—তা আর বলতে।

ভোগ হ'য়ে গেছে মায়ের। সেই থেকে নীরজাসুন্দরীর মুখে ওই এক কথা—একটু পেসাদের ব্যবস্থা করে দিস বাবা।

কমলের মাথায় কপালে পাদোদক দিলেন নীরজাসুন্দরী। খাওয়ালেনও। পুজো হলো, দর্শন হলো, এখন শুধু বাকি মায়ের একটু প্রসাদ পাওয়া। বেলা হয়েছে অনেক, ক্ষুধায় ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করছে কমল। এতক্ষণ দূরে দূরে ছিলো, ঘুরে ফিরেই দেখছিলো সব। পেটের ক্ষুধায় এখন কাছে এসে বসেছে।

ভোগের প্রসাদ এনে নীরজাসুন্দরীর হাতে দিলো বিশ্বনাশ। তা থেকে কমলকে খানিকটা দিয়ে নীরজাসুন্দরী বললেন—নে খা, খেয়ে সুস্থ হ্‌।

বিশ্বনাথ বললো—ছেলেটা কে ঠাম্মা?

—ওই যাঃ, ভুলেই গেছি আমি। যমুনার ছেলে। অই, অই কমলা ইদিকে আয়। বড্ডই বেতরিবদ ছেলেটা, মোটে কথা শোনে না। তারপর

বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—তাও বলি বাবা, বিয়ের পর ন মাস পড়তে না পড়তে ছেলে হলো যমুনার। নাদুসনুদুস কি সুন্দর দেখতে। যেন ছুয়ো মাসে হ'য়েছে। যমুনা আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা খেলো ছেলের। সব সময় চোখে চোখে রাখে যমুনা। আমরা ডাকি কমল, ওর বাপের দেওয়া নাম আর যমুনা ডাকে—পুতুল।

পুতুল! চমকে উঠলো বিশ্বনাথ—তাই হবে। তা নইলে অমন সুন্দর হয় কখনো! ঠিক যেন যমুনার মুখখানা। আর? মুহূর্তে দপ্ করে জ্বলে উঠলো বুকের ভেতরটা। না, এ ও দেখতে চায় না। সরে এলো বিশ্বনাথ।

ততক্ষণে তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়েছেন নীরজাসুন্দরী। সকাল সকাল ফিরতে হবে। ওদিকে কত চিন্তাতেই না রয়েছে যমুনা। বললেন—বিশু, এবার আমাদের যেতে হবে বাবা। একটু বাস নাগাদ পৌছে দিবি রে?

মন ঠিক সায় দিলে না। দিনটা কেটে গেলো ওই এক বুড়ির পেছনেই। কামাই? সে তো সামান্য, এতক্ষণ আর পাঁচটা লোক ধরতে পারলে বেশ কিছু রোজগার হতো কিন্তু তাও হলো না। অমত করতে পারলো না বিশ্বনাথ। নীরজাবুড়ী যেমন করে তাকালেন, সে দিকে তাকিয়ে অমত করার সাধ্য কি? বিশ্বনাথ বললো—চলো।

ভয়ানক দুরন্ত ছেলে যমুনার। একটুও ভয়ডর নেই। জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পাশাপাশিই চলেছেন নীরজাসুন্দরী বিশ্বনাথের সঙ্গে। চলতে চলতে মনটা যেন কেমন করে উঠলো। ভাবলেন, কি যেন বলার ছিলো তাঁর বিশ্বনাথের কাছে। কিন্তু বলা হলো না। মনে একবার পড়লো বটে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বনাথের মুখের দিকে কয়েকবার তাকিয়েও বলতে পারলেন না। ওই সংশয়। সাধু-মোহান্ত হয়েছে বিশ্বনাথ। মায়ের সেবক। সংসার ধর্মের কথা ওর আর ভাল লাগবে কেন? তা নইলে এতক্ষণের মধ্যেও কি একটিবার যমুনার একটা খবর জিজ্ঞাসা করতে পারলো না? আসলে সাধু-সন্তরা সব বুঝি ভুলে যায়। বিশ্বনাথ কি আর মনে রেখেছে নাকি যমুনাকে? তবুও সবিস্তারে না হোক, কিছু বলবেন বলেই স্থির করেছিলেন কিন্তু মনের কোথায় যেন খচ্‌খচ্ করে বিঁধছে। কিছুতেই বলতে পারছেন না।

আর বিশ্বনাথ, সেও সমস্ত সময় ধরেই উদ্বেল মন নিয়ে অপেক্ষা করছে— ঠাম্মা কিছু বলবে। বলবে যমুনা সম্বন্ধে। অন্ততপক্ষে সে কেমন আছে, কোথায় আছে এ কথাটা বললেও একটা সূত্র খুঁজে পাবে বিশ্বনাথ। তারপর সেও এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে পারবে। কিন্তু নীরজাবুড়ি এমনই শক্ত মানুষ যে, সে কথার ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। বিশ্বনাথের মনে হলো, তবে কি বুড়ি এখন ওকে ভয় করে? ওর আকুল মন বারবার অস্থির হয়ে উঠছে শুধু যমুনার খবর পাবার জন্য। বিশ্বনাথও তাকালো নীরজাবুড়ীর দিকে, চোখাচোখিও হলো। আর দুজনের মনেই কী এক অদৃশ্য সংশয় বেদনার সুরে বেজে উঠছে।

হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো কমল, বললো—দিমা, কিনে দিবি?

—কিনে দিবি! কিনে দিবি বললেই হলো? ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন নীরজাসুন্দরী, দেবো কোথা থেকে? তোর মা কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে পয়সা দিয়েছে, কিনবো কোত্থেকে? নে চল্।

—না, বেঁকে দাঁড়ালো কমল—আগে কিনে দে।

—ইঃ! সাধ দেখ না ছেলের, আশ্চর্য কঠিন ব্যঙ্গ নীরজাসুন্দরীর কণ্ঠে।

বিশ্বনাথ এগিয়ে এলো, বললো—কী নিবিরে খোকা?

—পুতুল।

সহসা যেন একটা থাপ্পড় খেলো বিশ্বনাথ। যা শুনতে চায় না, যা দেখতে চায় না, ঠিক তাই? বুকের ভেতরটা অব্যক্ত বেদনায় জ্বলে উঠলো ওর কিন্তু নড়বার উপায় নেই। যমুনার ছেলে পরনের কাপড় জাপটে ধরেছে।

যমুনার কথা মনে পড়ে গেলো বিশ্বনাথের। মনে পড়ে গেলো ছোটবেলার সেই স্মৃতি। খেলার ছলে স্বামী-স্ত্রী সাজতো ওরা। বয়স যখন বাড়লো, বুদ্ধি পাকলো সে সময় এক আধটু লজ্জা লজ্জা করতো কিন্তু যমুনা নাছোড়-বান্দা। কোন কথাই সে শুনবে না। বেশ মনে পড়ে, একটা ডল পুতুল ছিলো যমুনার। বড়সড় ডল। পুতুলটাকে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতো যমুনা। ওরা স্বপ্ন দেখতো বিয়ের, গল্প করতো সংসারের। তের বৎসর বয়স যখন যমুনার তখনও আশ্চর্য গিন্নিপনা। সেই ডল পুতুলটাকে কোলে কোলে রাখতো, বলতো—জানো, ঠিক এই রকম একটা ছেলে হবে আমার। এই রকম নাদুস-নুদুস আর সুন্দর। চোখ দুটো হবে ঠিক এই রকম টানা টানা, ডাগর।

গিরিশনার এই অভিনয়ে অনেক সময় অবাক লাগতো। আবার কেন যেন ভালোও লাগতো সেই সব কথা শুনতে। সে ভালো লাগার পেছনে ছিলো কেমন একটা লজ্জা। সেই ডলপুতুলটাকে খেলতে খেলতে বিশ্বনাথের কোলে বসিয়ে দিতো যমুনা, আর নিজেও বসে পড়তো পাশে। তারপর চোখে মুখে আশ্চর্য ভঙ্গি করে বলতো—ঠিক বাপের মত মুখখানি। ডাগর চোখ তুলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত যমুনা।

চৌধুরীদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। বড় চৌধুরীর দেনার দায়ে সম্পত্তির বেশির ভাগ লাটে উঠবার জোগাড। কিন্তু তাই বলে বড়-মার মেজাজ কম ছিলো না। যমুনা আর বিশ্বনাথের কথা তাঁর কানেও গিয়েছিলো। শাসন করতে তিনিও কম করেননি। কিন্তু একই সূত্রে যে দুটো মন, তারা দূরে সরে থাকবে কেমন করে।

একটা আশ্চর্য অনুভূতি আজও যেন বিশ্বনাথের বুকের অতলে তোলপাড় করে। সে দিন সেই রূপনগরেও এই অনুভূতিটা ছিলো ওর মধ্যে। সেই ডল পুতুলটার মধ্যে কী যেন খুজে পেয়েছিলো ও। কেমন যেন একটা শান্তির প্রলেপ অদৃশ্যভাবে লুকোনো ছিলো পুতুলটার গায়ে-গতরে। একটা আকর্ষণই যেন অনুভব করতো ও। আশ্চর্য একটা দুর্বলতাও। শুধুই ওর মনের মধ্যে পুতুল পুতুল একটা আকষণ। সে আকর্ষণের কথা, সে দুর্বলতার কথা যমুনাও জানতো। জমিদারবাড়ি থেকে লুকিয়ে এসে যখন দেখা হতো, যমুনার মুখে শুধু ওই এক কথা। ওই খেলার পুতুলের মধ্য দিয়েই বুঝি জীবন্ত একটা পুতুলের স্বপ্ন লুকিয়েছিলো ওদের মধ্যে।

শেষ দেখা হয়েছিলো বুড়োশিবতলায়।

কদিন থেকেই কি একটা দুর্বিসহ জ্বালা বিশ্বনাথের রক্তের অনুকণায় মিশে মিশে বিষ ছড়াচ্ছিলো। অস্থির মন নিয়ে শুধুই ও ভাবছিলো নীরজাসুন্দরী কথা। কী করে ও নিষ্কৃতি দেবে যমুনাকে? কোন উপায়ে?

হঠাৎ যমুনাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলো ও। এ যেন কল্পনারও অতীত। ওই অবস্থায় কী করে উঠে আসতে পারলো যমুনা? কিন্তু যমুনা জানতো এটাই ফিরবার পথ বিশ্বনাথের। তাই ও এসে দাঁড়িয়েছিলো বিশ্বনাথের জন্য। মুখোমুখি হতেই খেই হারিয়ে ফেললো বিশ্বনাথ। কয়েকটা দিনের অদর্শনের পর মনে হলো, যমুনা যেন অনেক শুকিয়ে গেছে। যেন এই ক-দিনে ওর বয়স বেড়েছে অনেক। ফোলা ফোলা ভেজা চোখ দুটোতে

অশ্রুক্ষরণের স্বাক্ষর। ম্লান একঝলক হাসলো যমুনা। কাছে সরে এসে অস্ফুট কণ্ঠে বললো—ভুলে গেছ, না?

কি উত্তর দেবে খুঁজে পেলো না বিশ্বনাথ।

ওর একটা হাত ধরলো যমুনা। ভেজা ডাগর চোখ দুটো মেলে তাকালো, বললো—একটুও মনে নেই, মায়া নেই? তবে যে বলতে—একঝলক কান্না ছাড়লো যমুনা।

হতবাক বিশ্বনাথ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো।

আরও একটু ঘন হয়ে এলো যমুনা। সরে এলো বুকের কাছে। বিশ্বনাথের মুখের ওপর ডাগর চোখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎই যেন বললো—তাহলে তোমার পুতুল?

চোখ দুটো ভিজে এসেছিলো বিশ্বনাথের। তারপর আর দাঁড়াতে পারে নি ও। সহসা যমুনার হাতটা ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছিলো সেদিন।

নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হয়েছিলো। খেলার ছলে একটা ভয়ানক ভ্রান্তি ঘটে গেছে। অস্ফুট একটা ফুলের কুঁড়ি কীট-দংশনে বিষাক্ত হ'য়েছে। এক রত্তি ওই মেয়েটার মনে প্রাণে বিষ-সঞ্চারের অপরাধে অপরাধী বিশ্বনাথ। অতন্দ্র জ্বালায় ও সারারাত ছটফট করেছে, মনে পড়েছে বড় মা-র কথা। যমুনার সঙ্গে মেলা মেশার খবর পেয়ে তিনি বলেছেন—কেটে বানের জলে ভাসিয়ে দেবেন। মনে পড়ছে নীরজাসুন্দরীর কথা, তাঁর অনুরোধ। বিশ্বনাথের হাত ধরে নীরজাসুন্দরী সেদিন কী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? যমুনাকে মুক্তি দিতে? মুক্তি! থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বিশ্বনাথ। তাই দেবে ও, চিরকালের জন্য মুক্তি দেবে যমুনাকে।

চেঁচামেচি সুরু করেছে যমুনার ছেলে। সে পুতুল নেবে।

বিশ্বনাথ বললো—কোনটা নিবি রে খোকা?

—ওইটা, ওই বড় ডল। একরাশ ছোট বড় পুতুলের মধ্য থেকে একটা বড় ডল-পুতুল তুলে নিয়েছে কমল।

ডল্! সেই ডল? পা কাঁপছে বিশ্বনাথের। তোলপাড় করে উঠছে বুকের ভেতরটা। তবুও যথাসাধ্য সংযত হ'য়ে দোকানীকে বললো—কত দাম?

—সাড়ে তিন টাকা, জবাব দিলো দোকানী।

সর্বনাশ! সে যে অনেক পয়সা। ক' দিনের রোজগার থেকে জমানো তিনটি টাকা আছে ট্যাঁকে। আর? হ্যাঁ, নীরজাবুড়ির পুজো বাবদ লাভের কড়ি আছে এগারো আনা। মনে মনে হিসাব করলো বিশ্বনাথ—সাড়ে তিন টাকা? তা হ'লে বাকি থাকছে মাত্র তিন আনা। সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। ক্ষুধাটা যেন মোচড় দিয়ে উঠছে থেকে থেকে। তিন আনা পয়সায়ই বা কি খাবে?

ভয়ঙ্কর রেগে গেছেন নীরজাসুন্দরী। কমলকে বকচেন—সাধ দেখো না মুখপোড়ার? রেখে দে, রেখে দে হারামজাদা। অত পয়সা পাবি কোথায়? কমলের হাত থেকে পুতুলটা কাড়তে চেষ্টা করছেন নীরজাসুন্দরী।

ঠিক তক্ষুণি বাধা দিলো বিশ্বনাথ—থাক ঠামা। নিক ওটা। ছেলেমানুষ নিতে দাও।

সহ্য করতে পারছিলো না বিশ্বনাথ। সহ্য হচ্ছিলো না নীরজাবুড়ির তিরস্কার। হাজার হ'লেও ও যে যমুনার ছেলে, পুতুল! নিশ্চয়ই কিনে দেবে বিশ্বনাথ। ওর শেষ সম্বল ব্যয় করতেও আজ আর কোন দ্বিধা নেই।

একটু দ্বিধা ওর মনে জাগতে পারতো কিন্তু নিজেকে ও সামলে রাখতে পারলো না। না না, সে হয় না। কী অধিকার আছে নীরজাবুড়ির যমুনার পুতুলকে এমন করে তিরস্কার করবার!

ট্যাঁক হাত্ড়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টাকাটা দোকানীকে ছুঁড়ে দিলো বিশ্বনাথ।

পুতুলটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমল। ঠিক যমুনার মত। যে ডল পুতুলটা বুকে জড়িয়ে ধরে সম্মুখে এসে দাঁড়াতো যমুনা, অবিকল যেন সেই দৃশ্য। সহসা চোখ পড়লো কমলের চোখে। চাবুক খেয়ে যেন আঁত্কে উঠলো বিশ্বনাথ। সেই চোখ! ঝিন্‌ঝিন্ করে উঠলো মাথা। সঙ্গে সঙ্গেই মুখে একটু হাসি টেনে এনে নীরজাসুন্দরীকে বললো বিশ্বনাথ—আচ্ছা ঠামা, আচ্ছা, আচ্ছা। কথা না বাড়িয়ে হন্ হন্ করে চলে গেলো বিশ্বনাথ। যেন একেবারেই আকস্মিক।

খুব খুশি হয়েই রসা রোডের দিকে এগুচ্ছিলেন নীরজাসুন্দরী। হঠাৎ পেছনে কে যেন ডাকলো।

—কে! পেছন ফিরে তাকালেন নীরজাসুন্দরী।

জোরে এগিয়ে আসছে বিশ্বনাথ এই দিকেই। এসেই একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো, বললো—তিন আনা পয়সা বেঁচেছে তোমার, ভুলেই গিয়েছিলাম। এই নাও। আর···চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠলো বিশ্বনাথের, একটা মুহূর্তের মধ্যে কেমন ভেজা চোখ তুলে তাকালো পুতুলের দিকে। তারপর ধরা গলায় অস্ফুটে বললো—আর, যমুনাকে বলো না আমার কথা।

পলক ফেলতে না ফেলতেই সহসা পুতুলকে পাঁজাকোল করে তুলে নিল বিশ্বনাথ। তুলে নিল একেবারে বুকের কাছে, বললো—কি ব'লে ডাকে যমুনা? পুতুল? আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখটা পুতুলের গালে, মুখে, বুকে ঘসে নামিয়ে দিলো। দিয়ে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না বিশ্বনাথ। যেন সহসা ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেলো সে।

সমস্ত .ঘটনাটাই ঘটে গেল একটা মুহূর্তের মধ্যে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হা করে তাকিয়ে রইলেন নীরজাসুন্দরী। মুখটা নিচু করে হন্‌হন্ করে এগিয়ে চলেছে বিশ্বনাথ। কী রূপ! সুদীর্ঘ, বলিষ্ঠদেহী বিশ্বনাথ এগুচ্ছে মায়ের থানের দিকে, যেন একটা সাধু সাধু জ্যোতি বেরুচ্ছে তার গা থেকে।

কী এক দুরন্ত জ্বালার বহ্নিশিখা দপ্‌দপ্ করে বিশ্বনাথের বুকের অতলে জ্বলে উঠলো। হন্‌হন্ করে এগিয়ে এসে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অশ্বত্থ তলায়। হৃদয় মনের সমস্ত পাষাণের ভিত্ আজ আলগা হয়ে গেছে। সব পাষাণ গলে গলে বরফ জলের মত হু হু করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সত্যি সত্যি আজ ওর চোখে জল। বিশ্বনাথ আজ কাঁদছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কোনদিন একটি মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা ভিজে ওঠে নি যার, সে আজ কাঁদছে।

ওর মনপ্রাণও গলে গেছে বুঝি আজ। একদিন ও সত্য মনে করেছিলো। ওর মনপ্রাণ কী এক ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে উঠেছিলো, ভেবেছিলো মানুষের জীবন পদ্মপত্র। মসৃণ পদ্মের পাতা বিশ্বনাথের জীবন। যত ঘটনা, যত মানুষ, যত সুখ-দুঃখ, বেদনা সব পদ্মপাতার ওপোর জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী। সেখানে শাশ্বত কিছুই নেই। শুধু একটা সত্য ও অনুভব করেছে। সে সত্য ধ্রুবতারার মত স্থির, চিরন্তন, চিরস্থায়ী। সে সত্য ওই ভক্তি। সবার ওপোরে কি একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় শক্তি রয়েছে। সে শক্তি ধর্ম। সে ধর্ম ওই পাথরের মূর্তির মধ্যে, মাটির পুতুলের মধ্যে। জন্মাবধি সুখ-দুঃখ, বেদনা আর আঘাত

সংঘাতের চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে একটা সূর্য-জ্যোতির কণিকা ও দেখতে পেয়েছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের অনেক ওপারে সেই শাশ্বত জ্যোতি যুগ যুগান্ত থেকে চির ভাস্বর। এই মুহূর্তে, আজ এই কথাই মনে পড়ছে ওর জীবনের এই নিরন্ত্র অন্ধকারের মধ্যে বুভুক্ষু প্রাণ যে শাশ্বত সূর্য-জ্যোতির কণিকা প্রত্যাশী, সেই কণিকার জ্যোতি দেখতে পেয়েছে ও আজ।

কি মনে হলো, সোজা চলে এলো ও গঙ্গার ঘাটে। জোয়ার ফাঁপা গঙ্গায় নেমে পড়লো বিশ্বনাথ। জীবনের যত অন্ধকার, হৃদয় মনের কত ক্লেদ সব ধুয়ে ফেলবে ও জাহ্নবী-যমুনার এই পবিত্র জল ধারায়।

কিন্তু কে যেন ওকে ডাকছিলো! কোন এক অদৃশ্য শক্তি! কোন এক সুদূর দিগন্ত! সহসা ও কঠিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মায়ের মন্দিরের মুখোমুখি। কালীঘাটের এই পুণ্যস্থানে জগৎ-জননী মা-কে ও দেখছে। কত রূপ তাঁর। কত রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভারতের স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ এই মা। কিন্তু আর একটি মানবী-দেবী দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ওর মনে সূর্য কণিকার সম্ভাবনায় জ্বলছে। না-না, ও যাবে না। ডাকুক সুদূর দিগন্ত কিংবা সেই অদৃশ্য শক্তি। ও এখানেই পড়ে থাকবে। একবার দেখবে, দেখবে তাকে। একদিন তাকে আসতেই হবে। হবেই। আর সেই দিন এই জগৎ-জননী মায়ের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ও দেখবে তাকে। দেখবে ওর পুতুলের মা-কে।

শেষ